খুদে প্রতিভা • ধারাবাহিক উপন্যাস • গ্রিসের অ্যাপোলো মন্দির
আনন্দমেলা
২০ জুলাই ২০২৩
৫টি কল্পবিজ্ঞানের গল্প
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
অঙ্কন মিত্র
যুধাজিৎ দাশগুপ্ত
ভিন গ্রহের কৃত্রিম বুদ্ধি
ভিনগ্রহীরা কি কৃত্রিম বুদ্ধি ব্যবহার করছে?
খে লা ধু লো
সাফ কাপ জয় ভারতের

আনন্দমেলা
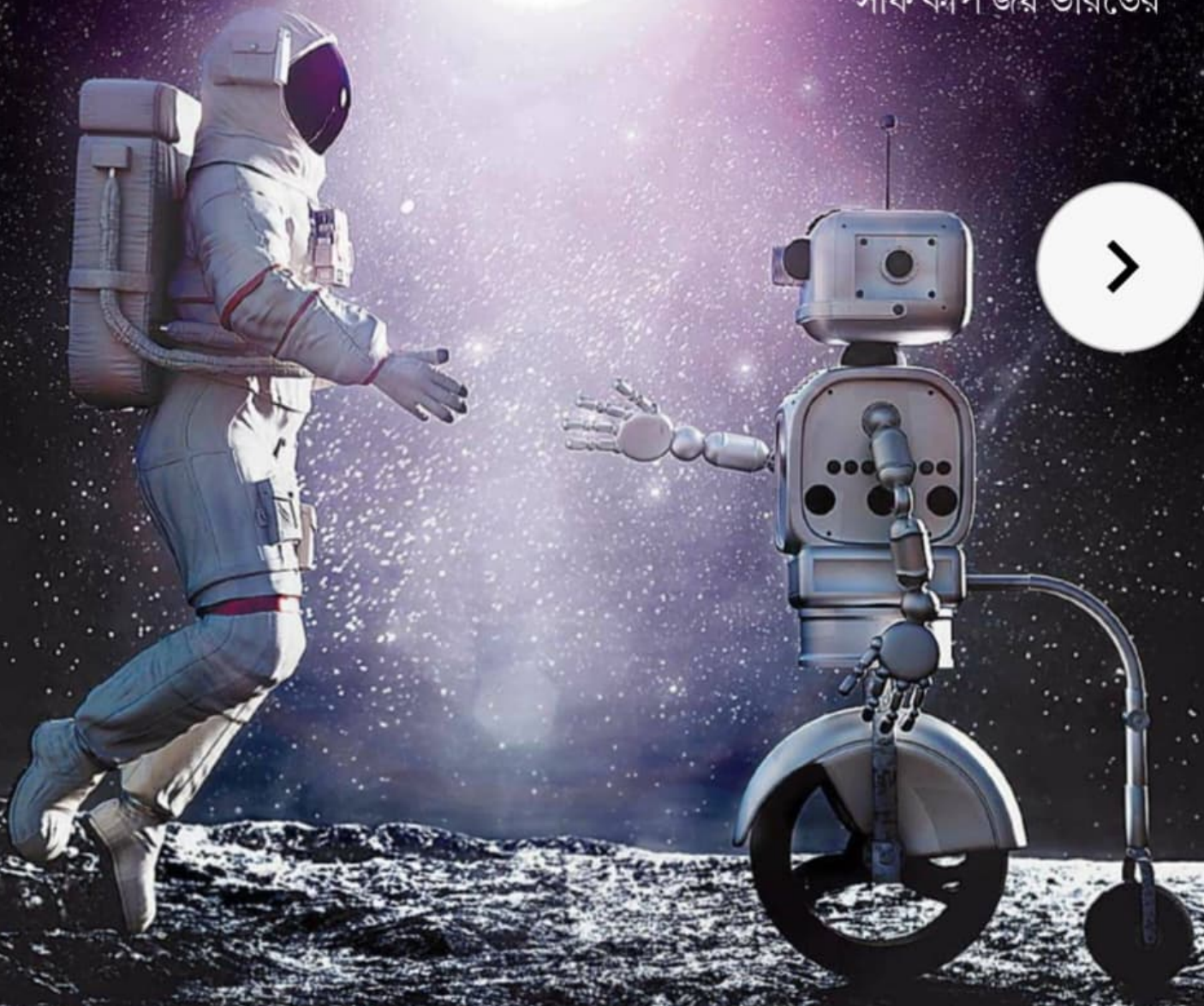
৪৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা ২০ জুলাই ২০২৩ ৩ শ্রাবণ ১৪৩০

কমিকস

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

প্রচ্ছদের ফটো: আইস্টক

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর, অসম আর ত্রিপুরার এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Edited by Caesar Bagchi and printed and published fortnightly by Pradipta Biswas on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

Year 49, Issue 6
RNI Regd No. 27057/75

খুব বৃষ্টিতে যখন জল জমে যায়, তখন অনেকের কষ্ট হলেও ছোটদের ভারী মজা। এ রকমই এক ঘন মেঘের দিন জমা জলে দেখলে... কী দেখলে? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

ছোটবেলা থেকেই আমার বৃষ্টি ভীষণ ভাল লাগে। বাড়ির সামনের রাস্তায় বৃষ্টির জমা জলে আমি কাগজের নৌকা ভাসাই। খুব বৃষ্টিতে যখন জল জমে যায়, তখন অনেকের কষ্ট হলেও আমাদের ছোটদের ভারী মজা। এ রকমই এক ঘন মেঘের দিন জমা জলে রাস্তায় নৌকা ভাসাতে গিয়ে দেখলাম, একটি পাগল মানুষ সেই জমা জলকে চা ভেবে বিস্কুট ডুবিয়ে খাচ্ছে। কারণ, দুটো জিনিসেরই রং এক। আমি এক ছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকে মাকে এনে দেখালাম। মা কিছু ক্ষণ দেখল, তার পর ভিতরে চলে গেল আর আমাকে বলল, "খেয়াল রাখিস, দেখিস যেন লোকটা চলে না যায়।" মিনিট চারেক বাদে মা কাগজের কাপে এক কাপ চা আর চারটে বিস্কুট এনে লোকটার হাতে দিল। লোকটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাল। তার পর মহানন্দে সেই চা বিস্কুট খেতে লাগল। চা খেয়ে পাগল মানুষটি চলে গেল। আমার মাও ঘরের ভিতর ঢুকে গেল বাকি কাজ সারতে। আমি ঘন মেঘের ফাঁক থেকে সূর্যের আলোর দেখা পেলাম।

চা-বিস্কুট

শ্রীজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, ইন্দা বালিকা বিদ্যালয়, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

এক দিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটায় ছোট-বড় বেশ কয়েকটা গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তে জল জমে গেছে। একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, জমা জলে কী যেন খলবল করছে। কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম দুটো কই মাছ! কী ভাবে পুকুর থেকে উঠে এসেছে। মনে পড়ল,গত পরশু দিন স্যর আমাদের লুপ্তপ্রায় মাছ পড়িয়েছিলেন। তাতে কই মাছের কথাও বলেছিলেন। সেই মাছ হঠাৎ দেখতে পাব, ভাবতে পারিনি। আমি কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখলাম মাছ দুটো গর্তের জল পেরিয়ে রাস্তা বেয়ে চলা শুরু করেছে। আমি একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে পুকুরে ফেলে দিলাম। বাড়ি ফিরে বাবাকে বললাম সে কথা। বাবা বলল, "ঠিক করেছিস। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাঁচিয়ে রাখা দরকার।" সে দিন রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম আর এক ঝাঁক কই মাছ পুকুর পেরিয়ে রাস্তা বেয়ে আসছে আমার বাড়ির দিকে আর বলছে, "ধন্যবাদ শ্রুতায়ুবাবু, আমাদের এমন ভাবে রক্ষা করার জন্য।"

শ্রুতায়ু পণ্ডা
পঞ্চম শ্রেণি, কৃষ্ণগঞ্জ কৃষি শিল্প বিদ্যালয়, হোগলা,পূর্ব মেদিনীপুর।

কই মাছ

দেশের বাড়িতে বর্ষায় বেড়াতে গিয়েছি। ভাবলাম, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি। বেরিয়েই দেখি রাস্তার জমা জলে কী যেন একটা লাফিয়ে উঠল। বুঝতে না পেরে কাছে গেলাম। তখনই কে যেন আমার হাত ধরে নিয়ে চলে গেল একটা গর্তে। গর্তের ভিতরে গিয়ে দেখলাম, আমি ব্যাঙেদের রাজ্যে চলে এসেছি। সেখানে ব্যাঙদের উৎসব চলছে। একটা ব্যাঙ আমার কাছে এসে বলল, "তুমিই আমাদের উৎসবের প্রধান অতিথি।" কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, "আমাকেই কেন প্রধান অতিথি করলে?" ব্যাঙটা বলল, "ভুলে গেলে! কিছু দিন আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে।" মনে পড়ল রাস্তার ধারের সেই নালা পরিষ্কার করার কথা। লাঠি দিয়ে নালার নোংরা খোঁচাচ্ছি। আমার পায়ের কাছে একটা ব্যাঙ। হঠাৎ একটা সাইকেল এসে পড়ল ব্যাঙটার কাছে। আমি লাঠি দিয়ে ব্যাঙটাকে ফেলে দিলাম নালায়। একটুর জন্য রক্ষা পেল ব্যাঙটা। ব্যাঙটা বলল, "কী এত ভাবছ! আমাদের উৎসব উপভোগ করো।" ওদের উৎসব দেখে হাততালি দিতে লাগলাম। হঠাৎ মা বলে উঠল, "কী রে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাততালি দিচ্ছিস কেন?"

সমৃদ্ধি সাহু
পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির(উঃ মাঃ), যমুনাবালী,আবাস, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ব্যাঙবাবাজি

চতুর্থ

খুব বৃষ্টি পড়ছে আজ। তাই স্কুলে যাইনি, খেয়েদেয়ে বারান্দায় এলাম। এখান থেকে একটু ঝুঁকলেই রাস্তা দেখা যায়। দেখি গোটা রাস্তা জুড়ে জলে জলময়। আর দেখি, একটা ছোট মাছ নালার মুখে আটকে পড়েছে। কী করব ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল সদ্য শেষ করা আইসক্রিমের খালি বাটিটার দিকে। আর একটুও সময় নষ্ট না-করে বাটিটা হাতে নিয়ে রেনকোট চাপিয়ে বেরোতে যাব, অমনি দিদি সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘এই বৃষ্টিতে কোথায় যাচ্ছিস?’’ সব খুলে বলতেই ও বলল, ‘‘চল, আমিও যাব।’’ তার পর দু’জন মিলে বাইরে বেরিয়ে বাটির মধ্যে মাছটা নিয়ে পাশের পুকুরের সামনে আসতেই মাছটা দিল এক লাফ! ওই লাফ দেখে তো আমরা হেসেই কুটোপাটি! ফেরার সময় দেখলাম একটা মা কুকুরের কোলের কাছে চারটে বাচ্চা কুকুর ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে! দিদি ওদের বাড়ি অবধি ডেকে নিয়ে এসে গ্যারেজের দরজা খুলে দিল আর ওরাও একটু স্বস্তি পেয়ে আমাদের গায়ে-হাতে চেটে দিতে লাগল। আর এক দিনে এত কিছু করতে পেরে ভারী আনন্দে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম!

কুকুর ছানা

সিদ্ধাত্রী দাস
তৃতীয় শ্রেণি, কিশোরনগর প্রাইমারি স্কুল, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

পঞ্চম

কদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে বসে পড়ছিলাম আর মা পাশে বসেছিল। ভাবছিলাম কখন মা স্নান করতে যাবে আর ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে খেলব। মা বাথরুমে যেতেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা ছাদে! ছাদে একটা ছোট্ট চৌবাচ্চা ছিল, সেটা দেখছি পুঁচকে একটা পুকুর হয়ে উঠেছে। ভাবছিলাম, ‘যদি এই জলে সাঁতার কাটতে পারতাম।’ ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে হল সব কিছু কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে। ছাদের রেলিংটা কেমন পাহাড়ের মতো উঁচু লাগছে। তাকিয়ে দেখি, চৌবাচ্চাটা মস্ত বড় পুকুর হয়ে গেছে। ‘আমি কি ছোট হয়ে গেছি?’ যাই হোক, জলে ঝাঁপ দিলাম। সবুজ মোটা-মোটা দড়ির জঙ্গল। একটা দড়ি ধরে ঝুলছিলাম, হঠাৎ দেখি, একটা বিরাট মশার লার্ভা হাঙরের মতো তেড়ে আসছে। জোরে সাঁতার শুরু করলাম। চোখের পলকে ব্যাঙাচির মতো দেখতে একটা বিরাট প্রাণী লার্ভাকে খপ করে খেয়ে নিয়ে তাকাতেই বললাম, “বাঁচালে ভাই।” হঠাৎ একটা মস্ত চারপেয়ে পোকা হামলা করল। প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে শ্যাওলার বনে এমন ঘুরপাক খেতে শুরু করলাম, পোকাটা ওখানেই শ্যাওলার দড়িতে বাঁধা পড়ে গেল। মন বলতে লাগল, ‘মিঠি, প্রাণ বাঁচাতে হলে এখান থেকে পালা’। পর ক্ষণেই টের পেলাম, কে যেন বলছে “ওঠ! ঘুমের মধ্যে পা চালিয়ে বিছানার কী হাল করেছিস!”

অদিতি বিশ্বাস
চতুর্থ শ্রেণি, সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন, হায়দরপুর, মালদহ।

আরও যারা ভাল লিখেছে

অর্ন চক্রবর্তী
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

তিস্তা দে
অষ্টম শ্রেণি, শিবপুর হিন্দু গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া।

ঋষভ বসু
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

কৌশিকী গঙ্গোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা।

দেবাংশী মিত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

উষ্মিক পাত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

চিত্রলেখা দাস
অষ্টম শ্রেণি, সাঁকরাইল গার্লস হাই স্কুল, হাওড়া।

সপ্তক ঘোষ
ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বীরভূম।

রম্যাণী নায়েক
ষষ্ঠ শ্রেণি, দোলনা ডে স্কুল, কলকাতা।

এ বারের প্রতিযোগিতা

সামনেই আসছে স্বাধীনতা দিবস। তোমার কাছে স্বাধীনতা শব্দের মানে কী? যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, আনন্দমেলার দফতরে লেখা পাঠাবে ১০ অগস্টের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। মনে রেখো। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ২০ অগস্ট সংখ্যায় ছাপব। anandamelamagazine@gmail.com এই ইমেল আইডি-তেই লেখা পাঠাবে, মেলবডিতে পেস্ট করে। ফটো তুলে পাঠাবে না।

ফারাক পাও

২টি ছবিতে অন্তত ৮টি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তার পর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ
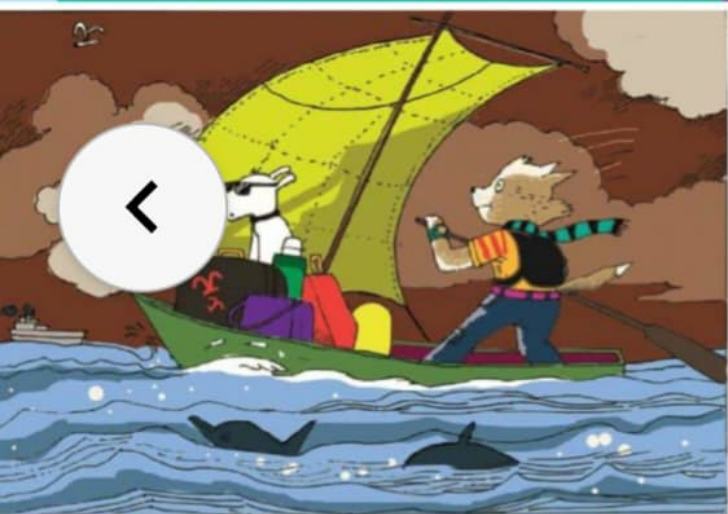
উত্তর: ৫ অগস্ট সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১। একটা রাজহাঁসের পা জলের উপর একটু দেখা গেছে।
২। ডান দিকের গাছের সবুজ পাখির মাথা বাদামি হয়েছে।
৩। বাঁ দিকের গাছের কাণ্ডে একটা গর্ত দেখা গেছে।
৪। দূরে একটা ঘর দেখা গেছে।
৫। হলুদ ফুল চারটে হয়েছে।
৬। দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা গেছে।
৭। ডান দিকের গাছে লাল পাখি ডানা মেলেছে।
৮। আকাশে বিমান দেখা গেছে।

সুদোকু

		৫		১			২	
	৩	২				৪		৭
		৭	৯					৬
				৯	৬	১		
			২	৮	১			
		৮	৩	৪				
৮					৫	২		
৭		১				৩	৫	
	৪			২		৬		

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এ বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এব নীচে কোনও লাইনে, এমনকি, ছোট- বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৬	১	৮	২	৫	৪	৭	৯	৩
৯	৩	৪	৬	১	৭	৮	২	৫
৭	২	৫	৯	৩	৮	৪	১	৬
৫	৯	১	৩	৪	২	৬	৮	৭
৮	৬	৭	৫	৯	১	২	৩	৪
২	৪	৩	৭	৮	৬	৯	৫	১
১	৭	২	৮	৬	৫	৩	৪	৯
৪	৮	৯	১	৭	৩	৫	৬	২
৩	৫	৬	৪	২	৯	১	৭	৮

জীব না হয়ে ভিনগ্রহীরা যন্ত্রও তো হতে পারে

ভিন গ্রহের কৃত্রিম বুদ্ধি

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধার বাড়বাড়ন্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভিন গ্রহেও এআই থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা কি আমাদের দেখা দেবে কোনও দিন? লিখেছেন **অচ্যুত দাস**

আমাদের ভিনগ্রহী খোঁজার পদ্ধতিতেই ভুল নেই তো?

১৯৮৪ সালে হলিউডে একটা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়ে সারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছিল। সে ছবিতে দেখানো হয়েছিল অবিকল মানুষের মতো দেখতে এক বিচ্ছিরি পাজি রোবটকে, যে ভবিষ্যতের পৃথিবী থেকে অতীতে ফিরে এসেছে। তাকে আটকানোর জন্য ভবিষ্যৎ থেকেই তার পিছু পিছু এসেছে এক জন মানুষও। সে-ই জানায়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কৃত্রিম মেধা অসীম শক্তিধর হয়ে পরমাণু বোমাটোমা ফাটিয়ে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে বসেছে। কৃত্রিম মেধার এই শয়তানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যতের যে ক'জন মানুষ, তাদের দলনেতার মাকে মেরে ফেলতেই অতীতের পৃথিবীতে ফিরে এসেছে ওই বদমাশ রোবট। সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগেই মা মারা গেলে সন্তানের জন্মও হয় না, বড় হয়ে সেই সন্তানের কোনও দলের নেতা হয়ে ওঠারও প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের মতোই দেখতে শয়তান রোবটটা কি অতীতে ফিরে এসে মানবজাতির শেষ আশা, ওই দলটার দলপতির মাকে মেরে ফেলতে পারল? অবশ্য সেই রোবটের হাত থেকে কী করে বাঁচলেন মহিলা? বিখ্যাত মার্কিন পরিচালক জেমস ক্যামেরনের পরিচালনায় জমজমাট ওই ছবিটার নাম, 'দ্য টার্মিনেটর'। প্রথম পর্বের তুমুল জনপ্রিয়তার পর টার্মিনেটরকে নিয়ে আরও কিছু ছবি হয়। যন্ত্রের বুদ্ধি বাড়তে থাকলে এক দিন তারা যা মানুষকে ছাপিয়ে চলে যেতে পারে, এই আশঙ্কা তার আগেও মানুষের মনে ছিল। টার্মিনেটরকে সিনেমার পর্দায় দেখে জনমানসে সেই ভয়টা আরও শক্তিশালী হল। তবে যেহেতু সালটা তখনও সবে ১৯৮৪, কম্পিউটার যেহেতু তখনও ঢাউস এক যন্ত্র, ইন্টারনেট তখনও অলীক এক স্বপ্ন— ফলে ছবিটা দেখে সিনেমা হল থেকে বেরোনোর পর ভয়ে কেউ আপাদমস্তক কেঁপে গেল না মোটেই।

ভিনগ্রহীদের সভ্যতাও হতে পারে যন্ত্রনির্ভর

সে দিন আর আজ

১৯৮৪ সালে একটা টাইম মেশিনে চেপে প্রায় চল্লিশ বছর এগিয়ে এলে পৌঁছোব আজকের সময়টায়। এত দিনে কম্পিউটার ছোট আর পাতলা হতে হতে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে হাজির। এক কালে শুধু জটিল অঙ্ক কষতে পারলেই আমরা যার পিঠ চাপড়ে দিতাম, সেই আদি গণক-যন্ত্র ইতিমধ্যে চেহারায় যত সূক্ষ্ম হয়েছে, তার বুদ্ধি এবং কার্যকারিতা বেড়েছে সে তুলনায় বহু গুণ। ইন্টারনেটের হাত ধরে কম্পিউটার আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত শত কাজে যে আসে— তালিকা বানাতে বসলে রাত কাবার! ইদানীং আবার শোনা যাচ্ছে, আমাদের আশপাশে টলমল পায়ে হাঁটতে শিখছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (সংক্ষেপে এআই) বা কৃত্রিম মেধা-রা। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সারা পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার তাদের নখদর্পণে। তার উপর নানা ওয়েবসাইট বা অ্যাপ যন্ত্রের মাধ্যমে তারা নিরন্তর কথা চলেছে পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের সঙ্গে। কিছু বলছে না, তখনও চুপটি করে বসছে শুনছে আমাদের কথা। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রত্যেক পাতা উল্টে, তাদের সঙ্গে অহরহ বার্তালাপে জড়িয়ে, ক্রমাগত নিজেদের ঘষেমেজে আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠছে এআই। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে, এই হারে উন্নতি করতে থাকলে খুব শিগগিরি মানুষের অনেক কাজই মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতায়, নেহাত অবলীলায় সেরে ফেলবে এআই। আর ঠিক এখানে এসেই আর একটা সম্ভাবনা ক্রমে জোরদার হচ্ছে।

আমাদের কল্পনার সঙ্গে না মিলতেই পারে ভিনগ্রহীরা

ওরাও এআই হলে

ভেবে দেখো, পৃথিবীতে বসে আমরা রেডিয়ো তরঙ্গের মাধ্যমে দূরদূরান্তে যোগাযোগ করার উপায় খুঁজে বের করেছি

লম্বা মহাকাশ সফরে যন্ত্রকে পাঠানোই শ্রেয়

ভিনগ্রহীরা বন্ধু হবে না শত্রু, কেউ জানে না

কত দিন আগে? কত আর, ওই একশো বছরের একটু বেশি আগে হয়তো। মাত্র একশো বছরে যদি সেখান থেকে আমরা কৃত্রিম মেধা অবধি এসে পৌঁছোতে পারি, তা হলে এই একই ঘটনা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও গ্রহেও তো হতে পারে? ভিন গ্রহে আমরা কবে থেকে শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে ব্যস্ত, কিন্তু এমনও তো হতে পারে— কোনও এক বা একাধিক ভিন গ্রহে জীবকুলকে বিনষ্ট করে ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছে কৃত্রিম মেধা? গল্পে-সিনেমায় উদ্ভট আকারের যে ভিনগ্রহীদের আমরা দেখি, এআই ভিনগ্রহীরা নিশ্চয়ই তেমন দেখতে হবে না। তা হলে কেমন হবে? কী করে তাদের আমরা খুঁজব?

সন্ধান চাই

খুঁজতে গেলে ঝাঁপ দেওয়া দরকার ব্রহ্মাণ্ডের অসীম মহাসমুদ্রে। দরকারে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যেতে হবে আরও দূরে। প্রয়োজনে যেতে হবে আমাদের আকাশগঙ্গা (মিল্কি ওয়ে) ছায়াপথ ছাড়িয়ে। কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া যায় না। পৃথিবীর নিকটতম আত্মীয় চাঁদে পৌঁছোতেই আমাদের আজও সময় লাগে অন্তত দিন তিনেক (নাসার অ্যাপোলো অভিযানে যেমন লেগেছিল)। মঙ্গলে যেতে সময় লাগে ৬ মাসের বেশি। এ বার আমাদের আয়ুর কথাটা ভাবি। পৃথিবীতে মানুষ বাঁচে আশি বছরের কাছাকাছি। কুকুর বাঁচে দশ থেকে পনেরো বছর। পাখিরা কেউ কেউ পঞ্চাশ বছর। আফ্রিকার হাতি বাঁচে ষাট-সত্তর বছর। কচ্ছপ, তিমি এবং কিছু কিছু মাছ কয়েকশো বছর বাঁচতে পারে বটে। তবে মোটের উপর আমাদের গ্রহের প্রাণীদের সর্বাধিক আয়ু একশো বছরের কমই। মানুষের ক্ষেত্রে আবার ভেবে দেখো, তার আয়ুর সমস্তটাই কি সে কাজ করতে পারে? জীবনের প্রথম এবং শেষ কুড়ি বছর সে দক্ষ ভাবে কাজ করার অবস্থায় থাকে না।

শুধু যাওয়া-আসা

এ বার ভাবি যাতায়াতের সময়টা। ব্রহ্মাণ্ডে দ্রুততম কে? আলো। শূন্য মাধ্যমে আলো এক সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার ছুটে যেতে পারে। মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করছে এমন হালকা মহাকাশযান বানানোর, যে অন্তত আলোর গতির দশ শতাংশ বেগে ছুটতে পারবে। তেমন যান বানানো গেলে, তাতে চেপে বসেও সূর্যের পরেই পৃথিবীর নিকটতম তারা আলফা সেন্টরি অবধি পৌঁছোতে সময় লাগবে প্রায় চল্লিশ বছর। মানে মাত্র কুড়ি বছর বয় যুবককে যদি আমরা অমন য দিই, আলফা সেন্টরি অবধি পৌঁছোবে যখন, তখন সে পা দি বার্ধক্যে। তার বয়স তখন ষাট বছর! শুধু পৌঁছোলেই তো হল না, তাকে তো আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতেও হবে। তাতে সময় লাগবে ওই একই। আরও চল্লিশ বছর!

বিপজ্জনক, একঘেয়ে

যদি ধরে নিই, কোনও এক আশ্চর্য উপায়ে অদূর ভবিষ্যতে আলোর চেয়েও দ্রুতগামী কোনও যান তৈরি করা গেল। তার পরেও মহাকাশ ভ্রমণের আপদ-বিপদের কথা ভুললে চলবে না। মাঝ পথে ইয়াব্বড় কোনও গ্রহাণু এসে হয়তো যানটা ভেঙে চুরমার করে দিল। আমাদের শরীরের জন্য বিপজ্জনক অনেক মহাজাগতিক রশ্মিই ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ক্ষণ। পৃথিবীতে বসে আমাদের গায়ে তাদের আঁচ লাগে না। কারণ, পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ওই রশ্মিগুলোকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠ অবধি পৌঁছোতেই দেয় না।

লম্বা সফরে মহাকাশযানকে হতে হবে দ্রুত গতির

কি... ...শযানে পৃথিবীর সেই নিরাপদ, নিশ্চিন্ত স্নেহচ্ছায়া নেই। যদি বা কোনও রকমে মহাকাশযানটাকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিপদ থেকে বাঁচানোর মতো দুর্ভেদ্য বানিয়েও ফেলা হল, ওই রকম লম্বা সফরে মহাকাশযাত্রীদের মনের অবস্থা কী হবে, ভেবে দেখেছ?

সবটা ভেবে দেখলে কিন্তু মনে হয়, ভবিষ্যতে লম্বা লম্বা মহাকাশ সফরে মানুষের পরিবর্তে বুদ্ধিমান যন্ত্রকে পাঠানোই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দূরে কিংবা কাছে, যেখানেই ভিনগ্রহীরা থাকুক না কেন, বুদ্ধিমান হলে তারাও একই পন্থা নেবে বলেই মনে হয় না কি?

হতে পারি সাইবর্গ

তা হলে দূরদূরান্তে মহাকাশ ভ্রমণের সম্ভাব্য উপায়? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অবশ্যই ভরসা রাখা যেতে পারে কৃত্রিম মেধা এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে 'কৃত্রিম শরীর'-এর উপর। এই মুহূর্তে মানুষের ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযান পরিকল্পনা দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ মানুষ মহাকাশচারী এবং সম্পূর্ণ যন্ত্র মহাকাশচারীর মাঝামাঝি। ভেবে দেখো, আজকের পৃথিবীতে কারও হাত বা পা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার বিকল্প হিসেবে ধাতব হাত-পা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, দুর্বল পায়ে টাইটেনিয়াম প্লেট বসানো হচ্ছে— সে তো কবে থেকেই। হৃদ্‌যন্ত্রের দেখভাল করার জন্য কবে থেকেই তো বুকে বসানো হচ্ছে পেসমেকার যন্ত্র। যন্ত্র আর মানুষের এই যুগলবন্দি, 'সাইবর্গ' আগামী দিনে আরও উন্নত হবে নিঃসন্দেহে। তেমন সাইবর্গের মনুষ্য অংশটুকুর নিরাপদ মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে এর পরেও দুশ্চিন্তা থাকলে, সেই চিন্তা দূর করার উপায়ও ভেবে ফেলেছেন কেউ কেউ। নিছক কল্পবিজ্ঞানের গল্পের পাতায় নয়, সত্যি-সত্যিই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন মানুষের মস্তিষ্ককে কা... আপলোড করে অমরত্ব দেওয়ার।

যন্ত্রের সঙ্গেই দেখা হবে যন্ত্রের

ডিজিটাল পুনর্জন্ম

আর-এক দল আবার চেষ্টা করছেন, এআই-এর সাহায্যে মৃত মানুষকে 'ডিজিটালি' পুনর্জন্ম দেওয়ার। তাঁদের গবেষণার মূল ভাবনা— এআই-কে কোনও ব্যক্তির ডিএনএ এবং অন্যান্য তথ্য যথাসম্ভব জুগিয়ে দাও। তা থেকেই এআই সেই ব্যক্তির অবিকল একটা প্রতিলিপি তৈরি করবে। তবে সেই প্রতিলিপি বা ফোটোকপিটা বেঁচে থাকবে শুধুই ডিজিটালি। এ ভাবে তৈরি কোনও মানুষের ডিজিটাল সংস্করণ আসল মানুষটার সঙ্গে কতটা মিলবে, সে নিয়ে অবশ্য সকলের মনেই এখনও সহস্র সংশয়, যেমনটা যে-কোনও নতুন উদ্ভাবনের আগে খুব স্বাভাবিক।

কেন কোনও সাড়া নেই

আচ্ছা, পৃথিবীতে বসে রেডিয়ো কিংবা টিভি সিগন্যালের যত তরঙ্গ আমরা গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ছড়িয়ে চলেছি, তারা তো এত দিনে ভাসতে ভাসতে মহাকাশের দূরদূরান্তে পৌঁছে গেছে। কই, কেউ তো তার কোনওটা

যন্ত্রের প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে

শুনে আগ্রহী হয়ে পাল্টা কোনও বার্তা বা উত্তর দিল না আমাদের? কী হতে পারে তার কারণ? হতে পারে— বুদ্ধিমান ভিনগ্রহীরা যদি বা থেকেও থাকে, তারা আছে আমাদের থেকে এমন এক সুবিশাল দূরত্বে, যে অবধি আমাদের পাঠানো সিগন্যাল এখনও পৌঁছোয়নি। হতে পারে ভিনগ্রহীরা কোথাও থেকে থাকলেও তারা এখনও আমাদের মতো এত উন্নত হয়নি যে, আমাদের পাঠানো বার্তা বুঝতে পেরে তার প্রত্যুত্তর দেবে। হতে পারে এও যে, আমাদের গ্রহে ঘটে চলা কাণ্ডকারখানার যেটুকু বুদ্ধিমান ভিনগ্রহীরা জানতে পেরেছে, তা দেখেশুনে তাদের মনে হয়েছে— এদের এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। আর যেটা হতে পারে তা এই যে, ভিনগ্রহীরা আদৌ আমাদের মতো নয়ই।

‘সেটি’ কী বলছে?

ভিনগ্রহীদের খোঁজার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, নাম ‘সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ (সংক্ষেপে এসইটিআই বা ‘সেটি’)। সেটি-র বর্ষীয়ান জ্যোতির্বিদ সেথ সোস্ট্যাক অনেক দিন আগে থেকেই বলছেন, “ভিনগ্রহীদের থেকে আমরা যদি পাল্টা কোনও সিগন্যাল পেয়েও যাই, মাইক্রোফোনের আড়াল থেকে সেই সিগন্যাল আমাদের মতো বহুকোষী, নরমসরম কোনও জীব পাঠিয়েছে— এমনটা আশা করা মোটেই উচিত হবে না।” আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হল ‘সেটি’ তন্ন তন্ন করে নানা উপায়ে ভিনগ্রহীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবু যে এত বছরেও কোনও পাল্টা সিগন্যাল ধরাই পড়ল না, ভিনগ্রহীদের কাউকেই এত বছরেও খুঁজে পাওয়া গেল না— তা দেখেই সোস্ট্যাক বলছেন, “ব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিমত্তা যদি থেকেই থাকে, জীবন্ত হওয়ার চেয়ে বরং তার কৃত্রিম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কল্পবিজ্ঞানের সিনেমার পর্দায় ছাইরঙা, বেঁটেখাটো, বড় চোখের, ন্যাড়া মাথা, নিরাবরণ ভিনগ্রহীদের দেখে যদি আমরা ভাবি সত্যি সত্যি ভিনগ্রহীরা অমনই দেখতে— আমাদের হতাশ হতে হবে।” সেটি-র ধারণা, ভিনগ্রহীরা কেউ এআই তৈরি করে থাকলেও, এআই-এর সেই ভিনগ্রহী নির্মাতারা নিজেরা হয়তো আর বেঁচে নেই। এই ধারণার সপক্ষে সোস্ট্যাকের যুক্তি, “এক বার কৃত্রিম মেধা তৈরি করতে পারলে তাকে কাজে লাগিয়ে আরও উন্নত কৃত্রিম মেধা তৈরি করা যায়। এআই এ ভাবে ক্রমাগত নিজেই নিজেকে উন্নত করতে থাকলে মোটামুটি পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সে এমন যন্ত্র তৈরি করতে পারবে, যে তার আগের সমস্ত যন্ত্রের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তো হবেই, এআই-এর নির্মাতাদের সবার বুদ্ধি একত্রিত করলেও সেই যন্ত্রের বুদ্ধি তার চেয়েও বেশি হবে।”

এ প্রসঙ্গে আর-এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ স্টুয়ার্ট ক্লার্কের মন্তব্য, “সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই— এআই-এর নিজের বুদ্ধি বাড়তে বাড়তে এক সময় সে নিজেই নিজের পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করে ফেলবে না তো? জীবন্ত যে প্রাণীরা তাকে তৈরি করেছে, তাদেরকেই তার অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছিত মনে হবে কি?” স্টুয়ার্টের এই আশঙ্কা আবার এক বার মনে করিয়ে দেয়, টার্মিনেটর-এর মতো ছবির গল্প, যেখানে গল্পের ছলে হলেও ঠিক এমনটাই ঘটতে আমরা দেখেছি।

কী ভাবে খুঁজছিল

সেটি কী ভাবে ভিনগ্রহী এআই খুঁ সে কথা ভাবার আগে জানা দরকা এ পর্যন্ত কী ভাবে ভিনগ্রহীদের খুঁজছিল? বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসানো গুচ্ছ গুচ্ছ রেডিয়ো টেলিস্কোপ ডিশ আকাশে তাক

এমন দেখতে না-ই হতে পারে ভিনগ্রহীরা

করে রেখে সেটি-র জ্যোতির্বিদরা আজ বহু বছর হল অপেক্ষা করে আছেন,

ব্রহ্মাণ্ডের দূরদুরান্ত থেকে আসা তীব্র বা ক্ষীণ সিগন্যালের হদিস পাওয়ার। ওই টেলিস্কোপ ডিশগুলো ঠিক কোন কোন দিকে তাকিয়ে ভিনগ্রহীদের খুঁজছে? উত্তর খুবই সহজ। শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে যে দিকে আমরা এখনও অবধি এমন গ্রহ খুঁজে পেয়েছি, যাদের সঙ্গে পৃথিবীর মিল আছে (যেমন যেখানে মহাসমুদ্র আছে, নিরুপদ্রব বায়ুমণ্ডল আছে), সে দিকেই তাকিয়ে কান পেতে ওই টেলিস্কোপ ডিশগুলো শোনার চেষ্টা করছে অচেনা কোনও সিগন্যালের ওঠা-নামার শব্দ।

কী ভাবে খোঁজা উচিত

সোস্ট্যাক এই পন্থায় ভরসা রাখতে না-পেরে বলছেন, ‘‘এটাই তো সমস্যা। নির্দিষ্ট কোনও দিকে তাক করে অনুসন্ধানে আমাদের লাভ নেই, কারণ প্রথমত— ভিনগ্রহীরা যে কোনও দিকেই থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিমান ভিনগ্রহীরা থেকেই থাকলে তাদের এমন জায়গায় খোঁজা দরকার, যেখানে বিপুল শক্তির (এনার্জি) ভান্ডার আছে। প্রচুর ভাবনা-চিন্তার জন্য প্রচুর শক্তি প্রয়োজন। ফলে বুদ্ধিমান ভিনগ্রহীদের তেমন কোনও জায়গায় খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হয়।’’ আচ্ছা, আমরাও তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিকে হুড়মুড় করে পর পর সিগন্যাল পাঠাতে পারি? তা হলেও তো কেউ তার কোনওটা ধরতে পেয়ে সাড়া দিতে পারে? কিন্তু এতে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। দুষ্ট কোনও ভিনগ্রহীর দল অমন কোনও সিগন্যাল খুঁজে পেয়ে তার উৎস খুঁজতে খুঁজতে আমাদের খুঁজে বের করে? খুঁজে পেলে যদি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়? জল-মাটি-খনিজে ভরপুর আমাদের এই একমেবাদ্বিতীয়ম নীল গ্রহটাকে যদি তারা কব্জা করতে চায়? এই দুর্ভাবনাটা আরও জাঁকিয়ে বসে যখন শুনি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংও এই একই আশঙ্কার কথা অনেক দিন আগেই বলেছেন, ‘‘নিজেদের দিকে তাকালেই আমাদের বোঝা উচিত, কেন বুদ্ধিমান প্রাণীর বিবর্তিত রূপ আমাদের প্রতি খুব বন্ধুভাবাপন্ন না-ও হতে পারে।’’

যন্ত্র আর যান্ত্রিক মেধা

বিজ্ঞানীদের অনেকেরই বিশ্বাস, বিবর্তনের নানা ধাপ পেরিয়ে মানুষ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে এখান থেকে তার আর উন্নতি করার তেমন জায়গা নেই। তার মস্তিষ্কের আয়তন বা কার্যক্ষমতা সুদুর ভবিষ্যতে আরও প্রচণ্ড বাড়বে বলে মনে হয় না। নিজের কাজ সে যবে থেকে যন্ত্রকে দিয়ে করাতে শিখেছে, তখন থেকেই তার ক্রমাগত চেষ্টা— যন্ত্রকে আরও উন্নত করার। যাতে তার নিজের কায়িক শ্রম কমে। সেই পথে এগিয়েই আজ আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি, যেখানে গায়ে-গতরে পরিশ্রম তো যন্ত্রেরা করছেই, এমনকি তাকে মানুষ বুদ্ধিও জোগানোর চেষ্টা করছে। যন্ত্র নিজেই বুদ্ধিমান হলে মানুষের ভাবনার কাজও কমবে। এই পথে এগোতে থাকলে এক দিন যন্ত্রকেই তার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ভিনগ্রহী খোঁজার কাজে জুতে দেওয়া যাবে। আর সেই খোঁজাখুঁজিটাও করতে হবে সেখানেই, যেখানে জীবনের উপযুক্ত পরিবেশ থাক বা না-থাক, যন্ত্রের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট খোরাক (অর্থাৎ শক্তি বা এনার্জি) মজুত আছে।

ভিন গ্রহে আমাদের মতো কেবলই জল কিংবা হাইড্রোকার্বনের মতো জীবনের শর্ত খুঁজে না-মরে তাই আগামী দিনে এআই খুঁজবে এমন পরিবেশ, যেখানে তারার আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। যেখানে আছে সিলিকনের মতো এমন সব মৌলের প্রাচুর্য, যারা যন্ত্রের বিকাশে কাজে লাগে। জল সেখানে না থাকলেই বা!

ফটো: আইস্টক

জ্রথম্ব

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

২০১৬

ল্যাবরেটরির মধ্যেকার লম্বা করিডর দিয়ে এগিয়ে আসছে দুটো লোক। এক জন সামান্য মোটা, বেঁটে আর অন্য জন লম্বা, পেটাই চেহারা। দু'জনের হাতেই পিস্তল! বেঁটে লোকটার নাম পিকে আর লম্বা লোকটি জোরাব।

এই দু'জনই মাস খানেক আগে এসেছিল বিজ্ঞানী ডক্টর কৈলাসনাথ আচার্যর কাছে। একটা ওষুধের জন্য।

ওষুধটার নাম জ্রথম্ব। এই ওষুধের একটা ট্যাবলেট খেলে মানুষের মধ্যে সেই ক্ষমতা চলে আসবে, যেখানে সে জীবজগতের নানান প্রাণীর দক্ষতা নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারবে। নানান রকম প্রাণীদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবে। মানুষ 'সুপার হিউম্যান' হয়ে যাবে!

ওষুধটার মধ্যে যে গুণ আছে, তা ভুল লোকের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই গোটা গবেষণাটাই খুব গোপনে করেছিলেন কৈলাসনাথ।

কিন্তু এই শয়তানগুলো কী করে খবর পেয়ে গিয়েছে কে জানে!

মাস খানেক আগে পিকে আর জোরাব এসে ওঁকে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের টোপ দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ওই অর্থের বিনিময়ে যেন ওদের ওষুধের ফর্মুলা আর প্রোটোটাইপটা দিয়ে দেয়।

কিন্তু কৈলাসনাথ দেননি। উনি বুঝেছিলেন যে, এরা খারাপ লোক। এদের হাতে এই ওষুধটা পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই এক রকম তাড়িয়েই দিয়েছিলেন।

তাও আজ ওরা এসেছে। আর একদম অন্য ভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছে, যাতে কিছুতেই আর খালি হাতে ফেরত না যেতে হয়।

এটা যে হবে, এক রকম আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কৈলাসনাথ। তাই ফর্মুলা আর প্রোটোটাইপ, দুটোই উনি নিজের স্ত্রী রুচিরার কাছে দিয়ে দুই ছেলে-সহ স্ত্রীকে এই জায়গা থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁকে মেরে ফেললেও তাই সেই জিনিস হাতে পাবে না শয়তানরা।

জোরাব পিস্তলটা তুলে শান্ত গলায় বলল, "ডক্টর, আপনি কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। জিনিসটা দিয়ে দিন আমাদের, তা হলে বেঁচে যাবেন।"

কৈলাসনাথ পিছোতে পিছোতে একটা টেবিলের সঙ্গে এসে আটকে গেলেন। দেখলেন, আর পিছোনোর উপায় নেই! তিনি বললেন, "কিছুতেই দেব না!"

পিকে চোয়াল শক্ত করে হাতের পিস্তলটা তুলে বলল, "তা হলে এ বার তুই মর!"

কিন্তু পিস্তলের ট্রিগার টেপার আগেই ল্যাবরেটরির কাচের দরজাটা খুলে গেল। কৈলাসনাথ দেখলেন, হিরণ্য এসে দাঁড়িয়েছে। হিরণ্য ওর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট।

কৈলাসনাথ চিৎকার করে উঠলেন, "হিরণ্য হেল্প! পুলিশে খবর দাও তাড়াতাড়ি!"

জোরাব দ্রুত হিরণ্যের দিকে ঘুরল।

হিরণ্য হাত তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল জোরাবের দিকে।

কৈলাসনাথ আবার বললেন, "দেরি কোরো না হিরণ্য... পুলিশকে ডাকো!"

হিরণ্য এসে দাঁড়াল জোরাবের সামনে। তার পর কৈলাসনাথকে অবাক করে দিয়ে জোরাবের থেকে পিস্তলটা নিয়ে তাক করল কৈলাসনাথের দিকে। বলল, "জ্রথম্বটা দিয়ে দিন স্যর! আমি আপনাকে রিসার্চে সাহায্য করলেও আপনি আমাকেও ভরসা করে ওষুধটা হাতে দেননি। এ বার দিন। প্রাণে বেঁচে যাবেন!"

কৈলাসনাথ চোয়াল শক্ত করে বললেন, "শয়তান! তা হলে তুই ওদের খবর দিয়েছিস! তা হলে দ্যাখ..."

কথা বলা মাত্র কৈলাসনাথ টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট্ট প্যাকেট তুলে ওই তিন জনের দিকে ছুড়ে দিতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই হিরণ্য আর পিকে-র পিস্তল ঝলসে উঠল।

কৈলাসনাথ স্থির হয়ে গেলেন। দুটো গুলি ওঁকে ভেদ করে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে লেগেছে। কৈলাসনাথ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। তার পর স্থির হয়ে গেলেন চির কালের মতো।

জোরাব হিরণ্যের থেকে পিস্তলটা ফেরত নিয়ে বলল, "এ বার জিনিসটা কোথায় পাব? বস রাগ করবেন!"

হিরণ্য বলল, "আমাদের খুঁজে যেতে হবে। ওঁর স্ত্রীও ওঁর মতো বায়ো-সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়র! তিনি দুই ছেলেকে নিয়ে কোথায় গিয়ে যে লুকিয়েছেন, কে জানে! জ্রথম্ব এমন একটা জিনিস, যা অমূল্য। যে ওটা পাবে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালী মানুষ হয়ে যাবে।"

২০২৩

লধুড়কা, পুরুলিয়া

॥ ১ ॥

গুন্ডা আর চিকু স্কুল থেকে ফেরার সময় আজ মল্লিকদের বাগানের পথে এল। বাগানটা ঘেরা নয়। তাই বড় বড় গাছ চার দিকে জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে। আর এর মধ্যে গুন্ডাদের বিশেষ আকর্ষণ হল চারটে জাম গাছ। গাছগুলোর জাম যেমন রসালো, তেমন মিষ্টি!

গুন্ডারা স্কুলের বাইরে বসা সাগরদার থেকে কারেন্ট নুন কিনে আনে। কালো নুনটা জিভের ডগায় ঠেকালেই চিড়িৎ করে কারেন্ট লাগার মতো অনুভূতি হয়। তাই এমন নাম!

ওই নুন দিয়ে জামগুলো ফাঁকা টিফিন বক্সে মাখে। তার পর সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খায়!

কিন্তু আজ কপালটাই খারাপ। দেখল জামতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাস ইলেভেনের নিলয় আর লাবু।

ওরে বাবা, এরা দু'জন স্কুলের সবচেয়ে খারাপ ছেলে। যেমন দুষ্টু, তেমন মারকুটে।

গুন্ডার ভয় লাগল। কারণ গত কাল ইন্টার-ক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্টে ওরা ক্লাস এইটের হয়ে খেলে নিলয় আর লাবুর ক্লাস ইলেভেনকে চার শূন্য গোলে হারিয়েছে।

আসলে এত দিন গুন্ডারা গো-হারান হারত। কিন্তু এ বার পুরো খেলাই পাল্টে দিয়েছে ওদের ক্লাসের নতুন ছাত্র ঈশান। পুরো নাম ঈশান আচার্য। ছেলেটা পড়াশুনো থেকে খেলাধুলো, সব দিকেই ভাল।

ওর একটা ভাইও আছে। নাম নৈঋত। যদিও সবাই ওকে রন্টু বলে ডাকে। রন্টু ক্লাস সেভেনে পড়ে। রোগা, শান্ত। আর পায়ে একটা অসুবিধে থাকায় ক্রাচ-স্টিক নিয়ে হাঁটে।

তা এই ঈশানই হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে খেলা পাল্টে দিয়েছিল।

খেলার শেষে লাবু এসে কলার চেপে ধরেছিল গুন্ডার। বলেছিল, "খুব বাড় বেড়েছিস, না? তোদের হচ্ছে!"

আজ গুন্ডা বুঝল, কেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে নিলয় আর লাবু।

"মল্লিকদের বাগান থেকে যে জাম চুরি করছিস? চোর!" লাবু চোয়াল শক্ত করল।

"আমরা মোটেই চোর নই। বাগানটার নাম মল্লিকদের বাগান, কিন্তু মল্লিক কারা কেউ জানে না। এটা মুক্ত বাগান। সবাই এখান থেকে ফল পেড়ে খায়," চিকু পাল্টা বলল।

"চুরি করে আবার মুখে মুখে কথা!" নিলয় ঠাস করে একটা চড় মারল চিকুকে।

চিকু রোগা-পাতলা ছেলে, মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে।

"ওদের ছেড়ে দাও!" রাস্তার অন্য দিক থেকে আচমকা একটা গলা ভেসে এল এ বার।

গুন্ডা দেখল ঈশান আর রন্টু এসে দাঁড়িয়েছে।

"কী বললি? দু'দিন এখানে এসে মস্তানি করা হচ্ছে? দেখাচ্ছি মজা!"

নিলয় প্রায় দৌড়ে গেল ঈশানের দিকে। কিন্তু গুন্ডাকে অবাক করে দিয়ে ঈশান পাল্টা দৌড়ে এসে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল নিলয়ের পেটে! হতভম্ব নিলয় প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল দূরে!

লাবু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু পর ক্ষণেই হাত তুলে এগিয়ে এল ঈশানকে মারবে বলে! ঈশান লাবুর হাতটা ধরে একটা প্যাঁচ দিয়ে কাপড় কাচার মতো করে আছাড়

মারল।
এক সঙ্গে দু'জনে চিৎপাত হয়ে ঘাবড়ে গেল খুব।
ঈশান চোয়াল শক্ত করে বলল, "কারও সঙ্গে অসভ্যতা করলে, এর চেয়েও বেশি মারব! এখন ভাগ!"
নিলয় আর লাবু মাটি থেকে উঠে পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল রাস্তার বাঁকে।
ঈশান এসে চিকুকে ওঠাল মাটি থেকে, তার পর বলল, "আর ভয় নেই।"
রন্টুও এসে দাঁড়াল পাশে।
গুন্ডা অবাক হয়ে শুধু ভাবল, এইটুকু ছেলের গায়ে এত জোর! কী করে?

ওরা যদি খেয়াল করত, তা হলে দেখত দূরে, বড় শিরীষ গাছের আড়াল থেকে দু'জোড়া চোখ ওদের দেখছে।

॥ ২ ॥

"ম্যাডাম, আপনার কাছে যে চারটে কাকাপো প্রজাতির প্যারট আছে, তার থেকে দুটো আমরা কিনতে চাই। ভাল দাম দেব।"
সামনে দাঁড়ানো লম্বা আর বেঁটে লোক দু'জনকে ভাল করে দেখলেন রুচিরা। কথাটা বলেছে বেঁটে লোকটা। আচ্ছা, এই লোকটা জানল কী করে ওর কাছে কাকাপো প্রজাতির প্যারট আছে? এই পাখিটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। তাই এই বাড়ির একটা অংশে চারটে এমন পাখি এনে সেগুলোকে বাঁচিয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইছেন রুচিরা।
রুচিরার স্বামী কৈলাসনাথ মারা গিয়েছেন সাত বছর আগে। ওঁর ল্যাবেই কারা যেন ওকে খুন করে। এমনটা যে হতে পারে সেই আশঙ্কা করেই রুচিরা আর ওঁদের দুই ছেলে ঈশান আর নৈঋতকে কলকাতা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কৈলাসনাথ।
এই সাত বছরে নানান জায়গায় ঘুরে মাস দুয়েক হল পুরুলিয়ার এই গ্রামে এসে থাকছে ওরা। কিছু দূরের কলেজে জুলজি পড়ান রুচিরা। বাকি সময়টা কাটান বায়ো-সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজের গবেষণার কাজ করে আর নিজের কাছে রাখা কিছু পাখিদের দেখাশোনা করে।
বায়ো-সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজের ক্ষেত্রটি জীবাণু, কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে প্রাণী ও গাছপালাদের নিয়ে তৈরি এই গোটা জীবজগতে বিস্তৃত। বায়ো-সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের কাজের দ্বারা খাবারদাবার, ফাইবার, ওষুধ ইত্যাদি নানান বিষয়ে মূল্যবান যোগদান করেন।
রুচিরা বলল, "দেখুন আমি পাখি দিতে পারব না। আপনারা আসুন।"
এ বার লম্বা লোকটা বলল, "একটা কথা ম্যাডাম। আপনার তো দুটো ছেলে। বড়টি জানেন, কেমন মারপিট করছে রাস্তায়!"
রুচিরা অবাক হয়ে গেল।
লম্বা লোকটি হেসে বলল, "অবাক হচ্ছেন? সাত বছর ধরে খুঁজে আপনাকে বের করেছি আমরা। তাই অনেক কিছুই জানি আপনাদের সম্বন্ধে।"
রুচিরা এ বার নিজের কাজের টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কী চাই, আপনাদের বলুন তো!"
বেঁটে লোকটা বলল, "আচ্ছা পাখি না হয় না-ই দিলেন। জ্রথন্ব-এর ফর্মুলা আর প্রোটোটাইপটা অন্তত দিন! আপনার হাজ়ব্যান্ডকে আমরা অফার করেছিলাম দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আপনাকে না হয় পনেরো দেব! আর রাজি না হলে, আপনাদের সেফটির গ্যারান্টি নেই কিন্তু।"
"আপনাদের সাহস তো কম নয়!" রুচিরা চিৎকার করে উঠল, "বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমার কাছে কিছু নেই। বেরিয়ে যান!"
লম্বা লোকটা হাসল। তার পর বলল, "সোজা আঙুলে ঘি উঠল না ম্যাডাম। এ বার যে আঙুল বাঁকাতে হবে!"

॥ ৩ ॥

সে দিন ঈশান যে ভাবে ওকে সাহায্য করেছে, তা গুন্ডা ভুলতে পারছে না। তাই মাকে দিয়ে পায়েস বানিয়েছে ঈশানদের জন্য। সেটা টিফিন বাক্সে নিয়ে সন্ধেবেলা বেরোল ও। সঙ্গে চিকুকেও ডেকে নিল।
দশ মিনিট হেঁটে শিমুলপাড়ায় ঈশানদের বাড়িতে এল ওরা। তার পর গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
"ঈশান, এই ঈশান!" চিৎকার করে ডাকল গুন্ডা।
একটু সময় নিয়ে বেরিয়ে এল রন্টু। হাতে ক্রাচ। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে ওকে।
চিকু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে? ঈশান কই?"
রন্টু দরজা খুলে দিয়ে বলল, "ভিতরে আয়!"
গুন্ডারা ড্রয়িংরুমে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, রুচিরা কেমন যেন থমথমে মুখ করে বসে রয়েছেন।
গুন্ডা বুঝল কিছু একটা হয়েছে! ও জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে কাকিমা? সমস্যা?"
রুচিরা বললেন, "তুমি তো গুন্ডা, না? তোমার বাবা তো থানার আইসি। খুব বিপদে পড়েছি বাবা! দু'জন শয়তান ঈশানকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে। ওরা পরিবর্তে একটা জিনিস চায়। আমি যে কী করি!"
"সে কী!" গুন্ডা চমকে উঠল! ওদের এই লোধুড়কা খুব সুন্দর, ছিমছাম জায়গা। সেখানে এমন কাণ্ড!
ও বলল, "এখুনি বাবার কাছে চলুন কাকিমা।"
"না," আচমকা গম্ভীর গলায় বলল রন্টু।
গুন্ডা আর চিকু চমকে গেল! না! কী বলছে রন্টু! না কেন?
রুচিরা বললেন, "রন্টু, তুই চুপ কর। নিজের ঘরে গিয়ে বোস! একদম বেরোবি না বাইরে!"
"আমাকে আর কত দিন আগলে রাখবে মা? অনেক হয়েছে। কাউকে খবর দিতে হবে না। আমিই দেখছি!" রন্টু কথা শেষ করে বাইরে বাগানে বেরিয়ে গেল।
"রন্টু শোন, এক বার শোন..." রুচিরা পিছন পিছন গেলেন।
গুন্ডা আর চিকু কিছুই বুঝতে পারছে না। কী হচ্ছে ব্যাপারটা! গুন্ডারা টিফিন বক্স রেখে বাইরে বাগানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।
বাগানটা এখন অন্ধকার। তাও চোখ সইয়ে নিয়ে গুন্ডা দেখল একটা ঝোপের কাছে, লাঠিটা মাটিতে ফেলে দুটো হাত দু'দিকে ডানার মতো মেলে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করছে রন্টু। আর ধীরে ধীরে আশপাশের গাছের থেকে, ঝোপের থেকে হাজার হাজার জোনাকি গিয়ে ঘিরে ধরছে রন্টুকে। সবজে আলোর এক বুদবুদের মধ্যে যেন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।
আচমকা একটা শব্দ হল। আর একটা বড় পাখি এসে বসল রন্টুর ডান হাতে! বাঁ হাতের পাতার উপর পাক খেতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। আর অদ্ভুত দেখতে কিছু পোকা এসে ওর দুটো পা ছেঁকে ধরল।
এ সব কী হচ্ছে! গুন্ডা আর চিকু রুচিরার

দিকে তাকাল।

রুচিরা বলল, "ভ্রূথস্ব!"

"মানে?" অবাক হয়ে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ওরা।

রুচিরা বললেন, "ঈশান আর রন্টুর বাবা কৈলাসনাথ এক জন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি একটা ওষুধ বের করেন। ভ্রূথস্ব নাম। নানান প্রাণীর থেকে রক্ত ও কোষ নিয়ে সেগুলো সিন্থেসিস করে তৈরি, কয়েকটা লজেন্সের মতো দেখতে ট্যাবলেট। কিছু খারাপ লোক সেই ভ্রূথস্বের জন্য কৈলাসকে খুন করে। আমরা পালিয়ে আছি তার পর থেকে। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে রন্টু অমন দুটো লজেন্স খেয়ে নিয়েছিল। তার পরেই ওর মধ্যে প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং তাদের শক্তি নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এসেছে। ওই যে পাখিটা, ওটা পেরিগ্রিন ফ্যালকন। দ্রুততম পাখি। এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু রন্টুর ডাকে ও বহু দূর থেকে আসে। ও রন্টুকে নিজের গতিবেগ দেয়। ওই জোনাকি রন্টুকে দেয় নিজের মধ্যেকার আলো বা বায়োলুমিনিসেন্স আর পথ খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা। ওই পায়ের কাছের পোকাগুলো হল হর্নড ডাঙ বিটল। প্রচণ্ড শক্তিশালী! নিজের ওজনের চেয়ে হাজার গুণ ভারী বস্তু তুলতে পারে। ওরা রন্টুকে দেয় শক্তি। আসলে ওই ভ্রূথস্ব রন্টুকে পৃথিবীর সমস্ত জীবের থেকে তাদের শক্তি আহরণ করার ক্ষমতা দিয়েছে! ও এখন নিজেকে প্রাণীদের শক্তিতে চার্জ করছে!"

"সমস্ত মানে? বাঘ, ভাল্লুকও?" চিকু হাঁ হয়ে গেল।

"সব। রন্টু দরকার মতো প্রাণীদের ডেকে নেয়! ও সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে। সবার কথা বুঝতে পারে! হ্যাঁ, ওর পায়ে সমস্যা আছে। কিন্তু এই সময়টাতে ওর পা ঠিক হয়ে যায়! সবার শক্তি পেয়ে ও এখন অন্য মানুষ!" রুচিরা বললেন।

"কিন্তু মৌমাছির থেকে ও কী পায়?" গুন্ডা জিজ্ঞেস করল।

"আমার সঙ্গে চল, দেখতে পাবি!" এ বার রন্টু কথাটা বলল!

গুন্ডা দেখল রন্টু এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। হাতে লাঠি নেই। চোখ দুটোয় কেমন যেন সবুজ রঙের আলো জ্বলছে! ও ভয় পেয়ে গেল।

"ভয় নেই।"

রন্টু ঝুঁকে পড়ে মাটিতে হাতটা ঠেকাল। আর মোবাইলের ম্যাপে যেমন ডাইরেকশন দেখায় সে ভাবে মাটিতে উজ্জ্বল সবুজ রঙের রেখা ফুটে উঠল।

রন্টু ওদের বলল, "এই পথে ওরা গিয়েছে। ওদের ফেরোমোনের ট্রেল ফুটে উঠেছে। আমাদের সবার মধ্যে ফেরোমোন থাকে। পতঙ্গরা খুব বুঝতে পারে। তোদের আজ খেলা দেখাব। তবে কাউকে বলতে পারবি না। প্রমিস!"

চিকু আর গুন্ডা এক বাক্যে বলল, "ইয়েস, প্রমিস!"

"দু'জনে আমার দুটো হাত ধর জোরে। আমরা শয়তানগুলোকে ধরব!" রন্টু আবার হাত মেলে দিল।

চিকু আর গুন্ডা চেপে ধরল দুটো হাত।

"স্টেডি! লেটস গো," বলেই রন্টু যেন হাওয়ার মধ্যে ভেসে উঠল। গুন্ডা আর চিকু হাত ধরে রয়েছে। কিন্তু আসলে রন্টুই যেন ওদের ধরে রয়েছে। অন্ধকার গ্রামের পথে ম্যাপের মতো উজ্জ্বল পথ নির্দেশ ধরে ওরা দ্রুত এগোতে লাগল।

গ্রামের শেষে একটা ছোট্ট বাড়ি। নিমেষে সেখানে পৌঁছে গেল ওরা।

রন্টু বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় নাক তুলে কী যেন শুঁকল। গুন্ডাদের বলল, "তোরা দূরে থাক!"

তার পর এগিয়ে গিয়ে এক হ্যাঁচকায় বাড়িটার লোহার দরজাটা উপড়ে আনল।

গুন্ডা বুঝল হর্নড ডাঙ বিটলের শক্তি।

"জোরাব, দ্যাখ কী হল!" ভিতর থেকে একটা বেঁটে লোক পিস্তল হাতে দৌড়ে এল বাইরে। পিছনে লম্বা মতো জোরাব নিয়ে এল ঈশানকে।

জোরাব বলল, "দেখ পিকে, ওই ভ্রূথস্ব-এর এফেক্ট! আমরা ভেবেছিলাম প্রোটোটাইপটা নেব। এখন এই ছোট ছেলেটাকেই গোটা ধরে নিয়ে যাব! ধর ওকে!"

পিকে আর জোরাব দু'জনেই পিস্তল উঁচিয়ে ধরতে গেল রন্টুকে। আর তখনই রন্টু দু'হাত তুলল। গুন্ডা হাঁ হয়ে গেল। দেখল রন্টুর আঙুল থেকে প্রচণ্ড বেগে সাদা জেলির মতো কী যেন বেরিয়ে গিয়ে পিকে আর জোরাবকে একদম ঢেকে দিয়ে শক্ত হয়ে গেল! শুধু ওদের মাথা দুটো কেবল বেরিয়ে রইল কোনও মতে!

গুন্ডা উত্তেজনায় বলে উঠল, "মোম! এটা মোম! মৌমাছিদের থেকে নেওয়া!"

জোরাব আর পিকে শক্ত মোমের মধ্যে আটকে গিয়েছে। এ বার রন্টু ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর দু'জনের মাথা দু'হাতে ধরে নিজের চোখ থেকে ওদের চোখের মধ্যে সবুজ আলোর রশ্মি ঢেলে দিল। জোরাবরা নেতিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আর তার সঙ্গে রন্টুও কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ঈশান গিয়ে ধরল ভাইকে। বলল, "ওর শক্তি শেষ। গুন্ডা, তোরা একটু হেল্প করবি!"

গুন্ডা জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী করলি রন্টু?"

রন্টু দুর্বল গলায় বলল, "ওদের সব স্মৃতি মুছে দিলাম। ওরা কিছু মনে রাখবে না। আর কোনও দিন খারাপ কাজও করতে পারবে না। মানুষকে শাস্তি না দিয়ে তাকে শুধরে দেওয়াই ঠিক বলে মনে হয় আমার। এ সব কাউকে বলিস না কিন্তু!"

গুন্ডারা এক সঙ্গে বলল, "আ প্রমিস ইজ় আ প্রমিস!"

॥ ৪ ॥

লধুড়কার থেকে অনেক দূরে ছোট্ট একটা পাহাড়ি শহরে কাঠের বাড়িতে বসে আছে এক জন মুণ্ডিত মস্তক মানুষ। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিরণ্য।

লোকটি গভীর গলায় বলল, "জোরাবরা তা হলে পারল না! কিন্তু ওদের যে ভাবে আটকানো হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ভ্রূথস্ব-এর খুব কাছেই গিয়েছিলাম। তুমি ওই লধুড়কায় যাও হিরণ্য। খোঁজ করো! ভ্রূথস্ব আমার চাই। যে-কোনও মূল্যে চাই।"

হিরণ্য মাথা নামিয়ে বলল, "ঠিক আছে বস!"

॥ ৫ ॥

স্কুল শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে আজ চার বন্ধু এক সঙ্গে আসছে।

গুন্ডা বলল, "যাক, খুব বাঁচান বেঁচে গিয়েছিস ঈশান। আর চিন্তা নেই, কী বল!"

ঈশান ধীরে ধীরে বলল, "না রে, চিন্তা আছে। ওরা ছাড়বে না। আবার আসবে। আরও বড় করে আসবে! আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

রন্টু শুধু হাসল। আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাল। অনেক উপরে একটা পাখি চক্কর মারছে। পেরিগ্রিন ফ্যালকন! ও শান্ত ভাবে বলল, "আসুক ওরা, আমরা দেখে নেব।"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

সূর্যঘড়ি

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

মিশুকের বয়স মাত্র দশ। ক্লাস ফাইভে পড়ে। কিন্তু এইটুকু বয়সেই ওর এক আশ্চর্য প্রতিভা আছে। 'স্যান্ড আর্ট' বানানো। স্যান্ড আর্ট অর্থাৎ বালি দিয়ে নানান কিছু তৈরি করা। সেটা কোনও মূর্তি হতে পারে, স্থাপত্য হতে পারে, সৌধ বা কেল্লাও হতে পারে। আর এই স্যান্ড আর্ট তৈরি করার সবচেয়ে ভাল

জায়গা হচ্ছে সমুদ্রের সৈকতের ভিজে বালি। কোনও সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে গেলে মিশুক ছটফট করে কখন সৈকতে গিয়ে নতুন একটা স্যান্ড আর্ট তৈরি করবে।

এ বার মিশুক বাবা মায়ের সঙ্গে পুরীতে এসেছে। তবে এখন বর্ষাকাল। সকাল থেকেই আকাশে মেঘ করেছে। তবুও মাকে পটিয়ে মিশুক জিনিসপত্তর নিয়ে হোটেলের সামনেই সৈকতে এসে নতুন একটা স্যান্ড আর্ট তৈরি করতে বসেছে। জিনিসপত্তর বলতে ছোট ছোট লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙিন সব বালতি, বেলচা, ম্যালেট ইত্যাদি। মিশুক এত নিপুণ হাতে স্যান্ড আর্ট তৈরি করে যে, যারা সমুদ্রে চান করতে আসে, তারাও কেউ কেউ এগিয়ে এসে দেখে। তারিফ করে। অনেকে মোবাইলে ফটো, ভিডিয়ো তোলে। তবে মিশুক এ সবে মন দেয় না। বরং ভিড় হলে বিরক্ত লাগে।

আজ মিশুক একটা সূর্যঘড়ি তৈরি করছিল। এই সূর্যঘড়ির নকশাটা জয়পুরের বিখ্যাত মানমন্দির যন্তর-মন্তরে দেখে মাথায় বসিয়ে নিয়েছিল। যে গাইড যন্তর-মন্তর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আশ্চর্য অনেক তথ্য বলেছিলেন। সে সবের অনেক কিছুই বুঝতে পারেনি মিশুক, কিন্তু নকশাটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। সেটাই করতে বসেছিল। তবে গাইডের দেখানো একটা জিনিস মনে আছে। সূর্যঘড়ির ডায়ালের ঠিক মধ্যিখানে একটা লাঠি আড়াআড়ি লম্বা করে রাখলে, তার ছায়া ডায়ালের যে জায়গায় পড়ে, সেটাই সঠিক সময়। অবশ্য মিশুক যেটা তৈরি করছে, সেটা অত সব মাথায় রেখে করছে না। তা ছাড়া, আকাশে সূর্য না-দেখা দিলে, সূর্যঘড়িতে ছায়া না-পড়লে, বোঝা যাবে না সেটা কেমন হল। সেটা নিয়েও মিশুকের মাথাব্যথা নেই। ঘড়ির কার্যকারিতার চেয়েও স্থাপত্যটা ঠিকঠাক করার দিকেই মিশুকের মন বেশি।

আকাশের মেঘ আরও ঘন হয়ে আসছে। যে-কোনও সময়ে বৃষ্টি নামবে। সমুদ্রের ঢেউগুলোও উত্তাল হয়ে উঠেছে। মা একটা হোগলার ছাউনির তলায় বসে বই পড়ছিল আর মাঝে মাঝেই পাতা মুড়ে মিশুককে ডাকছিল, "মিশুক, হোটেলে ফিরে চল। এ বার কিন্তু বৃষ্টি শুরু হবে।"

"আর-একটুখানি, মা। সান ডায়ালটা কমপ্লিট করে নিই।"

টুপ টুপ করে হাতে দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। অমনি মা হোগলার ভিতর থেকে হুড়মুড় করে উঠে এসে খপ করে মিশুকের হাতটা ধরে টেনে ধমকে উঠল, "কখন থেকে বলছি। এ বার বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এলে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে যাবে।"

মিশুক তাড়াতাড়ি বালতির মধ্যে নিজের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিল। হোটেলের সামনেই ছিল। হোটেল পর্যন্ত পৌঁছোনো পর্যন্ত অবশ্য ওই টুপটুপে বৃষ্টিটা ঝমঝমিয়ে এল না। ঘরে ঢুকে দেখল বাবা ঘুমোচ্ছে। বাবা এখানে রেস্ট নিতে এসে মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ে। মিশুকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য বানানো শেষ হল না সূর্যঘড়িটা।

মা বাথরুমে চান করতে ঢুকেছে। মিশুক বারান্দার বন্ধ দেওয়াল-জোড়া দরজাটার সামনে দাঁড়াল। বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় বৃষ্টির জলের ছাট আসছে। খুব ইচ্ছে করলেও এখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না। মিশুক চুপ করে কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখতে থাকল।

এখন সবে দুপুর। কিন্তু আকাশটা কালো মেঘে এমন ছেয়ে আছে যে, মনে হচ্ছে সন্ধে হয়ে গেছে। দূরে যেখানে সমুদ্র আর আকাশটা মিশে রয়েছে, সেখানে মাঝে মাঝেই আকাশটা চিরে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। এত বৃষ্টিতে সৈকত একেবারে ফাঁকা। তার মধ্যেই মিশুক খেয়াল করল, সৈকত ধরে একটা লোক হেঁটে হেঁটে আসছে। লোকটার গায়ে জলপাই রঙের রেনকোট। লোকটা এসে থামল মিশুক যেখানে সূর্যঘড়িটা বানাচ্ছিল, ঠিক তার সামনে। তার পর হাঁটু গেড়ে বসে সূর্যঘড়িটাকে দেখতে থাকল। পকেট থেকে কী একটা যন্ত্রের মতো জিনিস বের করে সূর্যঘড়িটার চার দিকে বোলাতে থাকল।

মিশুকের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। একে তো খুব মন দিয়ে সূর্যঘড়িটা তৈরি করছিল। বৃষ্টির জন্য সেটা শেষ হল না। তার পর ওই লোকটা যদি সূর্যঘড়িটাকে নষ্ট করে দেয়? এমন সময়ে ঘরের মধ্যে খর খর করে একটা আওয়াজ হল।

মিশুক মুখ ঘুরিয়ে দেখল। আওয়াজটা মনে হচ্ছে, স্যান্ড আর্ট করার জিনিসপত্তর রাখা বালতিটার মধ্যে থেকে আসছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বালতিটার কাছে। তার পর ঝুঁকে দেখে একটু অবাক হল। তার পরেই চোখে পড়ল একটা শামুক। খোলের মধ্যে থেকে মুখটা বের করে এ দিক ও দিক তাকাচ্ছে। তবে ওর চোখদুটো খুব অদ্ভুত। ঠিক মনে হচ্ছে মিশুকের সঙ্গে যেন কথা বলতে চাইছে। কিন্তু শামুকটা বালতির মধ্যে কী ভাবে এল? নিশ্চয়ই যখন মা তাড়াহুড়ো করছিল, তখন তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর তুলতে গিয়ে শামুকটাকে ভুল করে তুলে ফেলেছে। মিশুক ঠিক করল, বৃষ্টি থামলে শামুকটাকে আবার সৈকতের ধারে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আপাতত বালতির মধ্যেই থাক।

মা বাথরুম থেকে বেরিয়েই তাড়া দিল, "যা, যা। চান করে নে। লাঞ্চ করতে যাব। খিদে পেয়েছে।"

মিশুক চান করে বেরিয়ে দেখল বৃষ্টির তোড়টা একটু কমেছে। মা বাবাকেও ঘুম থেকে তুলে চান করাতে পাঠাল। ওই সময়ে মিশুক আবার কাচের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। গোটা সৈকতটা এখন খাঁ-খাঁ করছে। জলপাই রঙের রেনকোট পরা লোকটাকেও আর দেখতে পেল না।

হোটেলের রেস্তরাঁতে দুপুরের খাওয়ার পর মা দুপুরে ঘুমোবে বলে ঘরে চলে গেল। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাবা বলল বাইরে

পান কিনতে যাবে। মিশুক বলল, "আমিও বাবার সঙ্গে যাব।"

হোটেলের পাশেই পানের দোকান। দোকানদার যখন লাল-হলুদ-সবুজ মশলা দিয়ে পান সাজছিল, তখনই মনে পড়ে যাওয়ায় মিশুক বাবাকে বলল, "বাবা, আমি রুম থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসছি।"

"কী?"

"একটা শামুক," মিশুক বাবাকে বলল

ঘটনাটা।

বাবা বলল, "খুব ভাল। যা নিয়ে আয়। বেচারি যেখানে থাকে, সেখানে ছেড়ে দিয়ে আয়।"

মিশুক কিছু ক্ষণের মধ্যেই বালতিসুদ্ধ শামুকটা নিয়ে এল। আসার সময় অবশ্য খেয়াল করল, খোলের মধ্যে থেকে শামুকটা আর এক বারও মুখ বের করল না। পান সাজা হয়ে গিয়েছিল। বাবা পান মুখে দিয়ে মিশুকের জন্য অপেক্ষা করছিল। মিশুক আসতেই বলল, "চল।"

মিশুক বাবার সঙ্গে এগিয়ে এল সৈকতের মধ্যে, যেখানে সূর্যঘড়িটা তৈরি করছিল। বৃষ্টিতে কাজটা একটুও নষ্ট হয়নি। শুধু একটু একটু জল জমে আছে। যদিও সেটা সম্পূর্ণ হয়নি। বাবা তারিফ করে বলল, "আরে বাহ! দারুণ করেছিস তো! তুই তো দেখছি এক দিন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্যান্ড আর্ট আর্টিস্ট হবি।"

মিশুক বালতি উপুড় করে শামুকটাকে সৈকতের উপর ছেড়ে দিয়ে বলল, "বাবা, এটা কমপ্লিট হয়নি। শেষ করে নিই?"

বাবা মিটিমিটি হেসে বলল, "সে যখন তুই বালতি-টালতি, বেলচা সব নিয়ে এসেছিস, বুঝতেই পারছি। বেশ শেষ কর। আমি ওই হোগলার ছাউনির তলায় গিয়ে বসি।"

বৃষ্টি পড়ছে না, তবে আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। মিশুক আবার মন দিয়ে বাকি কাজটা করতে থাকল। কাজে মিশুক এতই মশগুল হয়ে গেল যে, দুটো জিনিস খেয়াল করল না। এক, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ এসে সৈকতে আছড়ে পড়ছে। অনেক ঢেউয়ের জল, অনেক দূর পর্যন্ত গেলেও কোনও ঢেউ মিশুকের কাছ পর্যন্ত আসছে না। যেন একটা অদৃশ্য অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেড়া ঘিরে রেখেছে মিশুককে। আর দুই, মিশুক খেয়ালই করেনি বাবা কখন হোগলার ছাউনির তলায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সূর্যঘড়ির ডায়ালে বারো ঘণ্টার বারোটা দাগ টানতে হবে। সেটা সবে শুরু করতেই মনে হল, কেউ যেন পিছনে এসে দাঁড়াল। মিশুকের হাতে কাঁটা ফুটে উঠল। একটু অস্বস্তি নিয়ে ঘাড়টা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখল, জলপাই রঙের রেনকোট পরা লোকটা। মিশুক তাকাতেই লোকটা লোকটা দু'হাত জড়ো করে বলল, "নমস্কার ঠাম্মি।"

লোকটা পাগল নাকি? একটা অচেনা লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে ঠাম্মি বলছে! নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে। এক্ষুনি ছুট্টে বাবার কাছে যেতে হবে। কিন্তু লোকটা বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পারে। মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত ভাবে বলল, "ভয় পাবেন না। আপনি সত্যিই আমার ঠাম্মি। মানে সম্পর্কে আমার ঠাকুরদার মা..."

লোকটা বলে কী! মিশুকের ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এক্ষুনি ছুট্টে বাবার কাছে পৌঁছোতে হবে। একটু দূরেই বাবাকে দেখতে পাচ্ছে হোগলার ছাউনির তলায় চেয়ারে ঘাড় কাত করে ঘুমোচ্ছে। মিশুক কিছু না-বলে, এক বুক শ্বাস নিয়ে দম বন্ধ করে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়োতে থাকল। কিন্তু দেখল যতই দৌড়োচ্ছে, কিছুতেই বাবার কাছে পৌঁছোতে পারছে না। যেখানে ছিল, সেখানেই যেন দাঁড়িয়ে আছে। আর লোকটাও ঠিক পিছনে।

লোকটা বলল, "আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, ঠাম্মি। আমি সত্যিই আপনার পুতি। ভবিষ্যৎ থেকে টাইম ট্রাভেল করে এসেছি। জানি না, আপনার এখন এত অল্প বয়স, টাইম ট্রাভেল আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব কি না। আসলে আমাদের হিসেবে একটা ভুল হয়ে যাওয়াতে, আমি যে সময়ে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম, তার চেয়ে চল্লিশ বছর আরও পিছিয়ে এসে পড়েছি। আর তাতেই মহা বিপদে পড়েছি। আমি কিছুতেই আর আমাদের সময়ে ফিরতে পারছি না। আমার যন্ত্র কাজ করছে না। এখন একটাই শুধু উপায় আছে।"

লোকটা যা বলছে, তার এক বর্ণ বুঝতে পারছে না মিশুক। তবে বুঝতে পারছে লোকটা সত্যিই পাগল। আর পাগলকে খুব ভয় করে মিশুক। ওদের স্কুলের সামনে একটা পাগল থাকে। স্কুলবাস থেকে নেমেই মিশুক আগে দেখে নেয়, পাগলটা কোথায়। যদি দেখে কাছাকাছি রয়েছে, এক দৌড়ে স্কুলের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু এখন তো দৌড়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।

লোকটা সেই মনের কথা পড়ে নিল, "না ঠাম্মি, দৌড়েও আপনি আমার প্র-প্রপিতামহের কাছে এখন আর পৌঁছতে পারবেন না। আপনি এখন একটা টাইম ট্র্যাপে আটকা পড়ে আছেন। এই রে, আবার নিশ্চয়ই ভাবছেন টাইম ট্র্যাপ আবার কী? আসলে আমি যে সময়ে এসে পড়েছি, সেখানে আপনি সবে ক্লাস ফাইভে পড়েন। কী করে যে বোঝাই আপনাকে... আচ্ছা বেশ, ধরুন এখন আপনাদের ঘড়িতে বাজে দুটো দশ। যদি দৌড়ে আমার প্র-প্রপিতামহের কাছে পৌঁছোতে আপনার এক মিনিট লাগে, তা হলে ওঁর কাছে যখন পৌঁছোবেন, তখন সময় হবে দুটো এগারো। কিন্তু সময় যদি থেমে থাকে, তা হলে দুটো দশ থেকে দুটো এগারো কখনওই হবে না। অর্থাৎ আপনি ওঁর কাছে পৌঁছোতেই পারবেন না। ঠাম্মি প্লিজ়, আপনি আমায় ভয় পাবেন না। আমি সত্যিই আপনার পুতি। আর আপনি জানেন না, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব যে, আমরা মিশুক সেনগুপ্তের বংশধর। যিনি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম নামী পরিবেশবিদ এবং আর্কিটেক্ট। সরি ঠাম্মি, আমি একটা খুব অন্যায় করে ফেলছি।"

এই প্রথম মিশুকের মুখে একটা কথা ফুটল, "কী অন্যায়?"

লোকটা বালির উপর বসে বলল, "টাইম ট্রাভেল, যেটা এই এখন আপনাদের সময়ে অসম্ভব মনে হয়, এখন থেকে দেড়শো বছর পরে, অর্থাৎ যে সময় থেকে আমি এসেছি, সেটা আর অসম্ভব নয়। টেকনোলজি সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। তার প্রমাণ এই আমি নিজে। আপনার সামনে রয়েছি। আপনাকে টাইম ট্র্যাপ দেখাতে পারছি। তবে সেই টেকনোলজি এখনও নিখুঁত হয়নি। আমি আসলে ভবিষ্যতের এক সাংবাদিক। আমি আসতে চেয়েছিলাম আপনার পঞ্চাশ বছর বয়সে, যখন আপনি আপনার খ্যাতির মধ্যগগনে। কিন্তু ওই..."

লোকটা চুপ করে গেল। মিশুকের ভয়টা একটু হলেও কেটেছে। লোকটা পাগল হলেও ভয়ঙ্কর নয়। এখন চিন্তা একটাই, বাবার কাছে কী ভাবে পৌঁছোবে।

লোকটা আবার খুব বিনীত গলায় বলল, "ঠাম্মি, আমি যে বিপদে পড়ে গিয়েছি, তার থেকে এক মাত্র আপনিই উদ্ধার করতে পারেন।"

"কী ভাবে?"

লোকটা একটু যেন ছটফট করে উঠল, "আসলে কী মুশকিল জানেন ঠাম্মি, টাইম ট্রাভেল করার আগে আমাদের একটা শপথ নিতে হয়। ভবিষ্যতের কোনও কথা আমরা জানলেও বলব না। তা হলে ভবিষ্যতটা সাংঘাতিক বিপন্ন হয়ে যাবে। এই যেমন

ধরুন, কাল কোন লটারির টিকিটের নম্বর ফার্স্ট প্রাইজ় পাবে বা আপনার সামনের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় কোন কোন অঙ্ক আসবে। আমি অবশ্য সেই শর্ত লঙ্ঘন করে দুটো অন্যায় করেছি। এক, আপনি ভবিষ্যতের একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা পরিবেশবিদ এবং আর্কিটেক্ট হবেন বলে দিয়েছি। আর দুই, আপনাকে একটা জিনিস দিয়েছি। অবশ্য তাতে ভবিষ্যতের কোনও হেরফের হবে না বলে হয়তো ক্ষমা পেয়ে যাব। কিন্তু ঠাম্মি, প্লিজ় আপনি সূর্যঘড়িটা তৈরি করা শেষ করে ফেলুন। এখানে আমার ঘড়ি কাজ করছে না। পৃথিবীর এই সময়ের সব ঘড়িতে সময়ের কিছুটা গলদ আছে। আমাদের ইতিহাস বলছে, মাত্র দশ বছর বয়সে কিছু না-বুঝেই পুরীর সৈকতে ক্ষণিকের জন্য আপনি একটা নিখুঁত সূর্যঘড়ি করেছিলেন। সেই ঘড়ির সঙ্গে আমার ঘড়ির সময় মিলিয়ে ফেলতে পারলেই আমি ফিরে যেতে পারব।"

কথাগুলো শুনে মিশুকের কী রকম একটা মনে হল। আচ্ছা, লোকটা পাগল হোক আর যা-ই হোক, চাইছে তো শুধু সূর্যঘড়িটা শেষ করতে। আর মিশুকও তো তাই চায়। চুপ করে ঘড়ির ডায়ালটা সম্পূর্ণ করে মধ্যিখানে একটা কাঠি পুঁতে দিল।

ঠিক এই সময়ে আকাশের ঘন কালো মেঘে যেন একটু ফাটল ধরল। একটা তীব্র সূর্যের রশ্মি সূর্যঘড়ির গায়ে পড়ল। মিশুক ডায়ালের মধ্যে যে কাঠিটা পুঁতেছিল তার ছায়াটা পড়ল একটা জায়গায়। লোকটা পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে সেই ছায়াটার উপর ফেলল। লোকটা খুব খুশি খুশি গলায় বলে উঠল, "থ্যাঙ্ক ইউ, ঠাম্মি। টাইম সিনক্রোনাইজ় করে গেছে। আপনি আমার অনেক অনেক প্রণাম নেবেন। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে চল্লিশ বছর পরে। ভবিষ্যৎ থেকে আপনার ইন্টারভিউ নিতে আসব। আপনাকে যে উপহারটা দিয়ে গেলাম, সেটা আপনাকে আজকের দিনটা মনে করিয়ে দেবে।"

লোকটা মিশুককে অবাক করে চোখের সামনে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর আকাশটা আবার ঘন মেঘে ঢেকে গেল। টুপ টুপ করে বৃষ্টি নামতে থাকল।

"ইস, মোবাইলটা রুমে ফেলে এসেছি। চল, রুমে যাই। বৃষ্টি ধরলে ফিরে এসে ফটো তুলব। এত সুন্দর হয়েছে।"

মিশুক দেখল, বাবা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বাবার হাত ধরে সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় বিশাল একটা ঢেউ এসে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঢেউটা ফিরে যেতেই বাবা আক্ষেপ করে উঠল, "ইস, এত সুন্দর তুই বানালি, ফটো তোলার আগেই ঢেউ ওটা নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল।"

মিশুকের অবশ্য আক্ষেপ নেই। কাল না হয় আর-একটা স্যান্ড আর্ট বানাবে। কিন্তু ওকে অবাক করল, যেখানে সূর্যঘড়িটা বানিয়েছিল, ঠিক সেখানেই পড়ে রয়েছে সেই শামুকটা। মিশুক এগিয়ে গিয়ে শামুকটা তুলল। নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, ভিতরে সেই অদ্ভুত চোখের পোকাটা আর নেই। তবে বাবা চোখ ছানাবড়া করে বলল, "দেখি, দেখি...

আরে এর মধ্যে তো এত বড় একটা মুক্তো! দ্যাখ, সমুদ্র যেমন নষ্ট করে দেয় তেমন উপহারও দেয়।"

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

পরিবেশ দিবস পালন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

বিশেষজ্ঞদের মতে ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ অনেক গুণ বাড়বে। এ ছাড়া আমাদের পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু প্লাস্টিক, তার ব্যবহার তো কোনও ভাবেই আটকানো যাচ্ছে না। নিজেদের হাতেই আমরা ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছি ধাত্রী পরিবেশকে। জুন মাসে বিশ্ব জুড়ে পালিত হল পরিবেশ দিবস। তবে প্রতি মুহূর্তেই পরিবেশ সচেতনতার পাঠ হওয়া জরুরি। এই পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মার্লিন গ্রুপের সিএসআর শাখা আই অ্যাম কলকাতা এবং টিডিএইচ সুইস ও ডিআরসিএসসি-এর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশকেন্দ্রিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছিল শিশুদের মধ্যে সিডস বল তৈরি, বৃক্ষরোপণ এবং ইকোব্রিক তৈরির কর্মশালা। কলকাতার সাতান্ন এবং আটান্ন নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচটি সহায়তা শিক্ষা কেন্দ্রের চারশোটিরও বেশি বস্তির শিশু এই উদ্যোগে উপকৃত হবে। পরিবেশকে কেন্দ্র করে সপ্তাহব্যাপী অনেক কর্মসূচির আয়োজনের মধ্যে রয়েছে স্ট্রিট থিয়েটার বা পথনাট্যের উপস্থাপনাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান পরিবেশ আধিকারিক শ্রী কে বালামুরুগান, গায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা শিশু অধিকার কমিশনের সদস্য সৌমিত্র রায় এবং প্রাক্তন অধ্যাপক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওশানোগ্রাফিক স্টাডিজ়ের প্রধান ডা. সুগত হাজরা।

লাইফ ইন স্নো ল্যান্ড অ্যান্ড আদার রাইটিংস

এই বইটি সম্বন্ধে বলার আগে এই বইয়ের লেখিকা উপাসনা দাশগুপ্ত সম্পর্কে একটি কথা বলা উচিত। তিনি কলকাতার একটি নামী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। শুধু তাই নয়। এর আগেও তিনি গল্প, কবিতা ছাড়া একটি উপন্যাসও লিখেছেন। ছোট্ট বন্ধুরা আগ্রহী হলে তো? এ বার আলোচনার বিন্দু হল, এই বইয়ের বিষয়। ছোট্ট ছোট্ট লেখা। বিষয়গুলো

মজার ঝাঁপি

বইটির প্রচ্ছদ
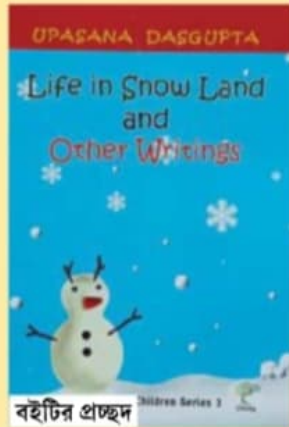
ভারী চেনা, কিন্তু তাদেরকেই একটা অচেনা ঝলমলে পোশাক পরিয়েছেন তিনি। ভারী ছিমছাম, স্বচ্ছ একটি লেখনীর প্রসাদগুণে। একটা চমৎকার মানবিক দৃষ্টিকোণ আছে এই ছোট্ট লেখিকার কলমে। যেমন ধরো, প্রজুষার পুজোর জামা কেনার গল্পটাই। পুজোর জামা কিনতে গিয়ে কোনও জামাই পছন্দ হয় না তার। শেষে অনেক খুঁজে মা যখন ক্লান্ত, একটা অতি সাধারণ জামা পছন্দ করে প্রজুষা। এ রকমই এক সহজতার ঠান্ডা নরম হাওয়া তোমায় ছুঁয়ে থাকবে বইটি পড়তে শুরু করলেই।

প্রকাশনা: চিন্তা
দাম: ৩০০ টাকা
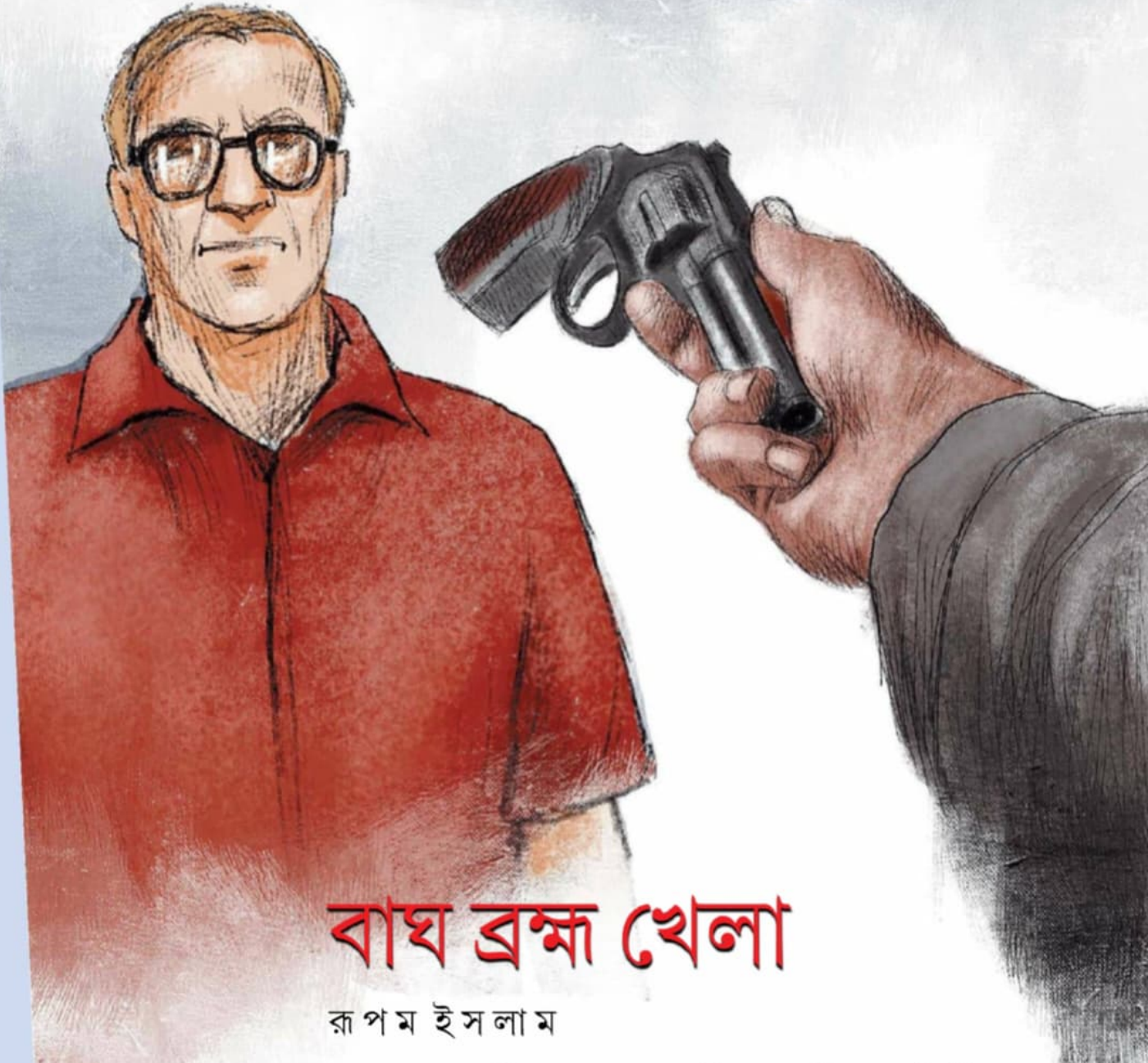
বাঘ ব্রহ্ম খেলা

রূপম ইসলাম

*(**আগে যা হয়েছে:** স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় একটি ভুল বোঝাবুঝিতে প্রাণ হারিয়েছিল জন চার্টওয়েলের প্রপিতামহ প্যাট্রিক চার্টওয়েল। এর পর লন্ডনে বিচারে কঠিন সাজা পান তাঁর ভাই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি চার্টওয়েল, যাঁর ছেলের নাতি জন। নানা টানাপোড়েনে পরিবারটি প্রবল আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন জনের মা। কিন্তু সব শোনার পর ব্রহ্ম ঠাকুর জনকে বলেন, এ সব অঘটনের জন্য তাঁকে দায়ী করতে পারেন না জন। তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই জন কলকাতায় এসেছে, তিনি জানেন। এও বলেন, জনের অসুস্থতা ভান ছাড়া আর কিছু নয়। জন প্রবল ভাবে অস্বীকার করেন সে কথা। জানান, বাড়ির কর্মচারীরাও রাতবিরেতে প্রেতের দেখা পেয়েছে।*

ব্রহ্ম ঠাকুর রিভলভারটা হাত থেকে নামিয়ে ড্রয়ারওয়ালা টেবিলটার উপরে রাখলেন। তার পর ড্রয়ার খুলে দুটো পাইপ আর একটা তামাকের পাউচ বের করে আনলেন। পাইপ দুটো হুবহু একই রকম দেখতে। পাইপগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ভুরু কুঁচকে একটা পাইপের গায়ে লেগে থাকা কী যেন একটা খুঁটিয়ে দেখলেন। তামাকের পাউচের জিপ খুলে এক

বার শুঁকলেন সেটা, আঙুল ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন মশলাটা। তার পর নিজের মনেই এক বার মাথা নেড়ে ওগুলো ড্রয়ারে আবার ঢুকিয়ে রাখলেন। তার পর রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "শোনো, আমার ঠাকুরদা জমিদার কৃষ্ণদাস মজুমদারেরও সর্বনাশ হয়েছিল। তিনি তাঁর অজান্তে যে পাপ করেছিলেন, তার ফল ভোগ করেছেন জ্ঞাতসারে। ভুল হয়েছে, এমন খবর জানা মাত্রই তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তো এটা না করলেও পারতেন! বিচারে তাঁর কালাপানির শাস্তি হয়েছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁর শেষ জীবন কাটে বন্দিদশায়। তবে এটা ঠিকই, তোমার মতো করে অভাব হয়তো আমি দেখিনি। তার জন্য আমার পিতাকে আমি ধন্যবাদ দেব। পিতার কর্মকুশলতায় আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অবস্থাপন্নই ছিলাম আমরা বলতে পারো, এমনকি আমি লন্ডনে পড়াশুনো করারও সুযোগ পেয়েছি। আসলে তোমাদের মতো অযথা একটা চিড়িয়াখানা পুষতে গিয়ে সর্বস্বান্ত তো হইনি! বিনা চিকিৎসায় আমাদের কারও মৃত্যুও হয়নি। আমরা টাকাকড়ির ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী ছিলাম জন!"

জন চার্টওয়েল কিছু বললেন না। শুধু কঠোর চোখে এক বার তাকালেন ব্রহ্ম ঠাকুরের দিকে, এক বার আশ্চর্যের দিকে। আশ্চর্য নোটপ্যাড আর পেন হাতে ব্যস্ত। সে রীতিমতো অভিনয় করছে ড. ব্রহ্ম ঠাকুরের সহকারীর ভূমিকায়।

ব্রহ্ম ঠাকুর আবার বললেন, "শোনো জন, কথায় কথা বাড়ে। আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত হয়ে আসছে, তোমাকেও হোটেলে ফিরতে হবে। নাও, তুমি বরং এটা ধরো।"

দৃঢ়চেতা কণ্ঠে এটুকু বলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জন চার্টওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন ব্রহ্ম ঠাকুর। তার পর তাঁর হাতে
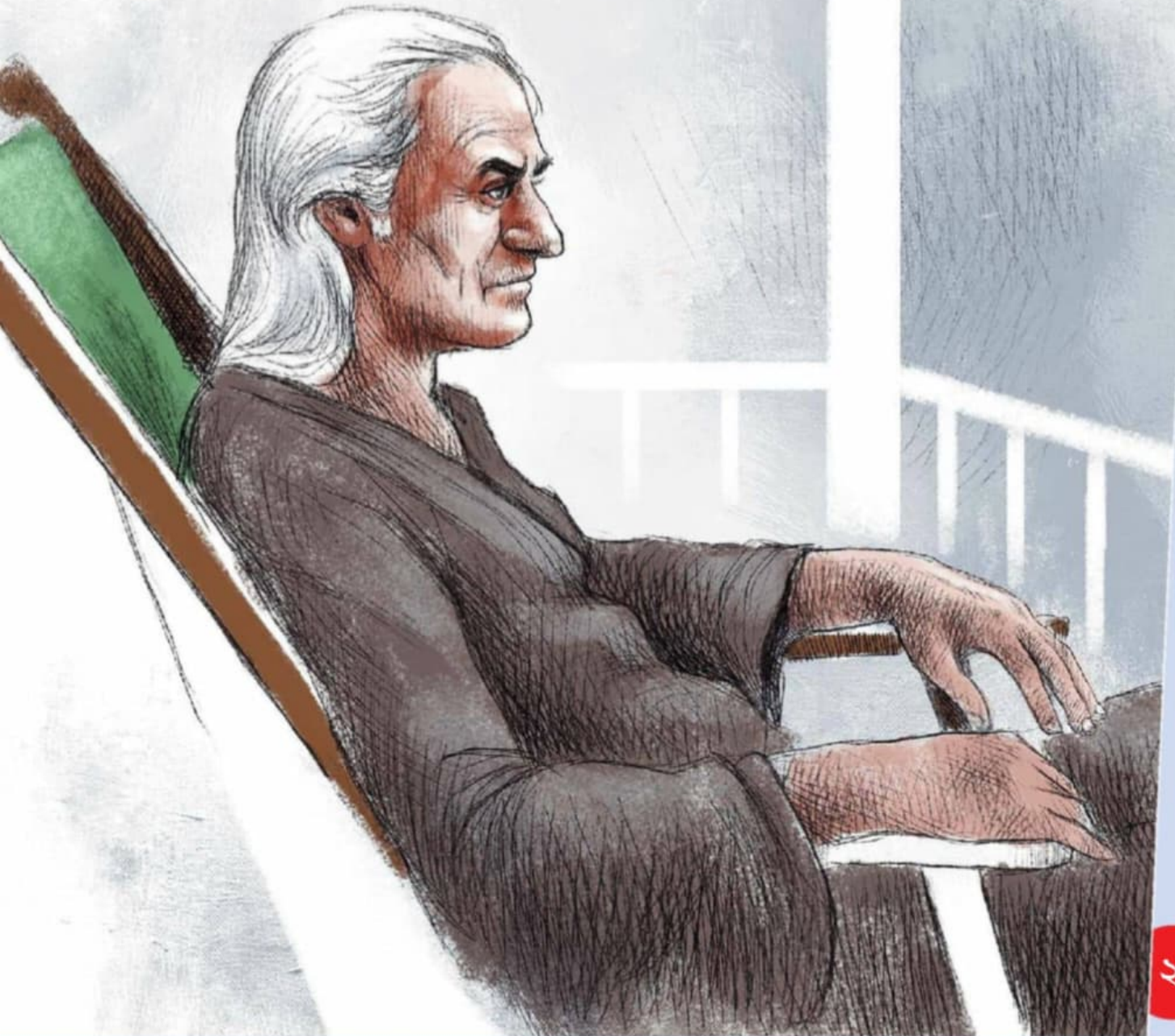
ধরা রিভলভারটা সটান তুলে দিলেন সাহেবের হাতে। বললেন, "এই নাও। মিটিয়ে ফ্যালো, তোমার প্রতিশোধের ইচ্ছে। আমাকে খতম করো। তবে তার আগে খতম করে ফ্যালো আমার এই সহকারীকে। ও ছোকরা তোমার ব্যাপারে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে, তাই নয় কি? তুমি তো আমাদের খতম করতেই চাও। নাও, আর দেরি কোরো না। চটপট সেরে ফ্যালো।"

এটা বলার পর অবশ্য ব্রহ্ম ঠাকুরের ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা শঠ হাসি। স্পষ্টতই বল এখন প্রতিপক্ষের কোর্টে। অনেক সময়ই এ ভাবে খেলাটা খেলতে ভালবাসেন তিনি। আক্রমণ করার প্রথম সুযোগ শত্রুকেই দেন। তার পর যথাসময়ে আটকান। কথায় বলে না ওস্তাদের মার শেষ রাতে!

॥ ৬ ॥

।। আগে কী ঘটেছিল এবং পরে কী ঘটবে ।।

প্রিয় ব্রহ্মদত্যিদের ডাক্তার,

মহাকাশযোগের নিয়মিত গোপন সঙ্কেত মহাকাশে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর উপর ত্রিভুজাকারে বিন্যস্ত যে স্থানবিন্দুগুলো থেকে, সে বিষয়ে কিছু লিখছি না এখানে। তা যেমন চলার চলুক। আমাদের নবতম সংযোজন 'শব্দ-ব্রহ্ম' প্রকল্পও সাফল্য আনবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু আজ হঠাৎ পাওয়া একটা আজব খবরে অনেকটা এগিয়ে গেছে মহাকাশের অচিন প্রাণীর অস্তিত্ব আর যোগাযোগের খোঁজ, অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছে এখন। তাই সে সম্পর্কিত অভিযানে বেরিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তোমায় একটি লিখিত ধারণা দিয়ে যেতে চাইছি। স্বাভাবিক ভাবেই এই কাজে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়লে তখন বেশি যোগাযোগ স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ। তাই হুট করেই এই বার্তা। এখন এখানে মানে লন্ডনে রাত দশটা (আমি একটা কাজে লন্ডনেই এসেছিলাম কয়েক দিন আগে)। ভারতের সময় এখানকার তুলনায় অনেকটা এগিয়ে, ফলে আমাদের সুপারসনিক বিশেষ যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছি না। অযথা কেনই বা তোমার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করব? তুমি ভোরে উঠে জানলেও চলবে। বরং আগামিকাল সকাল-দুপুরের জন্য একটা হোমটাস্ক দিচ্ছি তোমায়। ডাক্তার, তুমি একটু পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রথম দুটো ভিনাইল রেকর্ড একটু খুঁটিয়ে শুনবে? এমপিথ্রিতে সাঙ্গীতিক শব্দের সব ফ্রিকোয়েন্সি মোটেই ধরা পড়ে না— তাই লং প্লেয়িং রেকর্ড চালিয়েই আগাগোড়া শুনতে হবে। আমার হাতে এখন সেটা করার সময় নেই।

কেন এই কাজ করার অনুরোধ করছি, সেটা এ বার বলি। তুমি তো জানোই— তোমার পুরনো বন্ধু সিড ব্যারেটের 'স্পেস রক' তৈরি করাটা নিতান্তই শখের ব্যাপার ছিল না। একটা বিশেষ সন্ধান ছিল, যা সে খুঁজে পেয়েছিল বহু দেশের বহু প্রাচীন পুঁথি থেকে। তুমিই তো বলেছিলে লন্ডনের সেই ইউএফও ক্লাব, যা প্রতিষ্ঠা করেছিল জো বয়েড, যেখানে গোড়ার দিকে অনুষ্ঠান করত পিঙ্ক ফ্লয়েড, তার এ হেন নামকরণেও ছিল সিড ব্যারেটেরই পরামর্শ! যাই হোক, এই ব্যাপারে তো আমাদের দু'জনেরই পড়াশোনা আছে। আমরা জানি, তিন বছরের মধ্যে ছ'বার ফ্লাইং সসার বা ভিনগ্রহীদের মহাকাশযান দেখা যাওয়ার কথা ইংল্যান্ডের একটা বৃত্তাকার অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু আমি যদি আজ তোমায় জানাই সপ্তম বারও সেখানে ইউএফও দেখা গেছিল? এমনকি শুধু দেখাই যায়নি, ভিনগ্রহীদের অবতরণও ঘটেছিল? আর তার প্রভাব সোজা গিয়ে পড়েছিল সিডেরই উপর? আমার সম্ভাবনা রয়েছে সেই লুকিয়ে রাখা অবতরণস্থল খুঁজে বের করার। আমি এখন রওনা দিচ্ছি সেই উদ্দেশ্যেই।

সিড কেন আদৌ স্পেস রক করতে গেছিল, তার পিছনে সত্যিকারের কোনও মহাকাশীয় যোগাযোগ ছিল কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করতে আমি যখন এর আগে কেমব্রিজ যাই, জেনি স্পায়ার্সের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওর ভাই জ্যাকের সঙ্গে পিঙ্ক ফ্লয়েড ছাড়ার পর সিড একটা ব্যান্ড তৈরি করেছিল নাম দিয়েছিল 'স্টারস'! নামটা শুনেই বোঝা যায় কোন দিকে ছিল তার দৃষ্টি। জ্যাক স্পায়ার্সের বন্ধু ম্যাথু হার্ডিকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম সিডের শেষ দিকের অপ্রকাশিত কাজ খুঁজে বের করতে। তা সেও অনেক দিন হল! ওরা দু'জন সম্প্রতি সিডের তেমন কিছু হোম রেকর্ডিং আচমকা খুঁজে পেয়েছে, যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আর পেয়েছে সিডের কিছু পেন্টিং। লোকে জানে ওই ছবিগুলো সিড নষ্ট করে ফেলেছিল। কিন্তু আসলে ছবিগুলো কোনও অজ্ঞাত খামখেয়ালিপনায় লুকিয়ে রেখেছিল সিড নিজেই। হার্ডি এত দিনে তা খুঁজে বের করেছে।

হার্ডি এবং জ্যাকের মনে হচ্ছে আমাদের অনুসন্ধানে এই ছবিগুলো আর সিডের রেকর্ড করা কয়েকটা অপ্রকাশিত গান সাহায্য করতে পারে। আমি যাচ্ছি সেই সব সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখতে। ডাক্তার, তুমি পারলে আমায় জয়েন করো। তুমি এলে খুব ভাল হবে। আমরা কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তুমি তোমার হেঁড়ে গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাবে। মধুর সেই গান শুনে আমাদের মন শান্ত হবে।

তবে আসার আগে সিডের প্রকাশিত গানগুলো আর-এক বার যাচাই করে এসো। পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রথম দুটো অ্যালবাম আর সিডের সোলো অ্যালবামগুলো বিশেষ করে। তোমার কাছে তো সব রেকর্ডই আছে। হয়তো ওখানে কোথাও দেওয়া আছে সূত্রের শুরু। যার শেষটা উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমি।

> **দৃঢ়চেতা কণ্ঠে এটুকু বলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জন চার্টওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন ব্রহ্ম ঠাকুর। তার পর তাঁর হাতে ধরা রিভলভারটা সটান তুলে দিলেন সাহেবের হাতে। বললেন, "এই নাও। মিটিয়ে ফ্যালো তোমার প্রতিশোধের ইচ্ছে। আমাকে খতম করো। তবে তার আগে খতম করে ফ্যালো আমার এই সহকারীকে। ও ছোকরা তোমার ব্যাপারে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে, তাই নয় কি?..."**

ওয়েল ডাক্তার, সি ইউ ইন ইংল্যান্ড!

তোমার এরিক

ডার্কওয়েবের অতি গোপন এক লিঙ্কে ক্লিক করে এরিক দত্তের চিঠিটি পড়ে মনে মনে উত্তেজিত হলেন ব্রহ্ম ঠাকুর। তার পর এগিয়ে গেলেন তাঁর রেকর্ড কালেকশনের দিকে। ঝেড়েপুঁছে বের করে আনলেন পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রথম রেকর্ড 'দ্য পাইপার অ্যাট দ্য গেটস অফ ডন'। তাঁর মতে সঙ্কেত থাকলে থাকবে এই রেকর্ডটাতেই। এর নামকরণে একটা ইশারা আছে। দ্বিতীয় রেকর্ডের নামই যখন 'আ সসারফুল অফ সিক্রেটস'— সেখানে কোনও সিক্রেট কোডের থাকবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। বরং সেই নামকরণ করাই হয়েছে প্রথম রেকর্ডে সিক্রেট কোড গুঁজে দেওয়ার পরেই, ভয় পেয়ে। লোকে না বুঝে ফেলে! তাই বিভ্রান্ত করতেই দু'নম্বর রেকর্ডের অমন নাম— এটা ব্রহ্ম ঠাকুরের দৃঢ় বিশ্বাস।

রেকর্ডটা চালিয়ে দিয়ে তিনি এসে বসলেন উঠোনে রাখা একটা আরামকেদারায়। দরজার দিকে পিঠ করেই বসলেন। আজ এই দরজা দিয়ে একটা হামলা হতে পারে। ব্রহ্ম সাত সকালে একটা অচেনা সন্দেহজনক বুটের ছাপ দেখেছেন, সদর দরজার ঠিক সামনেই। অতর্কিত হামলা যদি হয়, আরামকেদারার পিঠের অংশ তাঁর ঢাল হবে। দেখে কিছু বোঝা না গেলেও ওটা আসলে বিটিটু প্রকল্পের জাপানি সহযোগী কিশিমোতো কোম্পানির আর-একটি কেরামতি। সাক্ষাৎ বুলেটপ্রুফ আরামকেদারা!

পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রথম রেকর্ডটাই সেই অ্যালবাম, যেটা বলা যায় আগাগোড়া সিড ব্যারেটের সন্তান। দ্বিতীয় অ্যালবামে সিডের অংশগ্রহণ অনেকটাই কম। আ সসারফুল অফ সিক্রেট অ্যালবামের একদম শেষ গানে সিড গাইতে আসে। এসে অদ্ভুত ভাবে বলে,

It's awfully considerate of you to think of me here
And I'm much obliged to you for making it clear
That I'm not here
And I never knew we could be so thick
And I never knew the moon could be so blue
And I'm grateful that you threw away my old shoes
And brought me here instead dressed in red
And I'm wondering who could be writing this song...

লক্ষ্যণীয়, এই গান যখন রেকর্ড করা হয়, তখন সিড পিঙ্ক ফ্লয়েডে পুরোপুরি নেতার আসনে, কোনওরকম ভাবেই ব্যান্ডে টলমল করছে না তার অবস্থান। তা হলে কী করে লিখল, রেকর্ড করল এমন ভবিষ্যৎবাণী-সুলভ লাইনগুলো? ব্রহ্ম ঠাকুর ভেবেই রোমাঞ্চিত হন— কিছু একটা মিস্টিক নিশ্চয়ই ঘটেছিল সিডের মধ্যে। অনেক সময় বজ্রপাতের মধ্যে পড়ে বেঁচে যাওয়া লোক দৈব ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। আজ এরিকের চিঠি পড়ে তাঁর মনে হচ্ছে— তা হলে নিশ্চয়ই সিড ভিনগ্রহীদের সংস্পর্শে এসেছিল। তাতেই কি তার বিশেষ ক্ষমতা এবং মনোবিকারসুলভ অক্ষমতা তৈরি হয়েছিল? আজ যখন মহাকাশ-বিজ্ঞানে মানবসভ্যতা এক নতুন মোড়ে অপেক্ষা করছে নতুন সমস্ত বিস্ময় নিয়ে, এ রকম একটা সন্ধি ক্ষণে সিডের ব্যাপারগুলো নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করে দেখা জরুরি— এরিক একদম ঠিক কথা বলেছে!

কিছু পরে আশ্চর্যের সঙ্গে রেকর্ডটা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই ব্রহ্মের মনে হল, 'চ্যাপ্টার চব্বিশ' গানটা কোনও দিকে নিশ্চয়ই নির্দেশ করছে। ইউএফও-র সপ্তম দর্শনের কথা তো ইঙ্গিতে বলা আছেই— যদিও তা বলা হয়েছে ফিউচার টেন্স-এ। আর 'চব্বিশ'! এই সংখ্যাটাও কি লুকোনো কিছুর বার্তা দিচ্ছে?

এই চিন্তার তরঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হল ইংল্যান্ড থেকে জন চার্টওয়েল নামক এক আগন্তুকের হঠাৎ আগমনে। সারা দিন কেটে গেল চার্টওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তায়, নরমে গরমে। সন্ধেবেলা চার্টওয়েল সাহেব বিদায় নিলেন। কিছু পরে বাড়ি ফিরে গেল আশ্চর্য। তার পর ব্রহ্ম ঠাকুর আবার সুযোগ পেলেন পিঙ্ক ফ্লয়েড এবং সিডের গানের মধ্যে নিহিত সূত্র উদ্ধারের কাজে ফিরে আসতে। ফিরে এসেই তিনি চালিয়ে দিলেন পিঙ্ক ফ্লয়েড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সিডের রেকর্ড করা প্রথম অ্যালবাম 'দ্য ম্যাডক্যাপ লাফস'। এবং এটা শোনার পরই এরিককে জবাবি চিঠি টাইপ করতে বসলেন। এই চিঠিও, বলা বাহুল্য, পাঠানো হবে ডার্কওয়েবের অন্ধকার ঠিকানায়।

প্রিয় এরিক,

আজ সকালে পড়া তোমার চিঠি আমার ভাবনার নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রথম অ্যালবামের চ্যাপ্টার চব্বিশ গানটি আবারও মনে হল, অসীম তাৎপর্যপূর্ণ। এই গানে কিন্তু সপ্তম ইউএফও-র কথাই ইশারায় বলা আছে। দ্বিতীয় কথা হল, চব্বিশ একটি র‍্যান্ডাম নম্বর। চিনের আই-চিং দর্শনের কোন অধ্যায়ে তুমি তোমার জীবনের চালিকাশক্তি খুঁজে পাবে, তা বের করার জন্য বিশেষ লটারি করা হত। সিডের ক্ষেত্রে ওই সংখ্যাটাই ছিল চব্বিশ। সিডের অপ্রকাশিত গানের পাণ্ডুলিপি পেলে চব্বিশ সংখ্যাটা অবশ্যই মনে রেখো। সংখ্যাটা মনে রেখেই সূত্র খুঁজো।

আমি চব্বিশের 'দুই' এবং 'চার'— এই সংখ্যাগুলো দিয়ে সিডের একক অ্যালবামের গানগুলোকে কাটাছেঁড়া করে তোমার ভাবনারই কনফার্মেশন পেলাম। তোমায় জানিয়ে দিই এই 'দ্য ম্যাডক্যাপ লাফস' অ্যালবামের দ্বিতীয় গানের দু'নম্বর লাইন থেকে চার নম্বর লাইনে সিড লিখেছে,

Where I can't see because I understand
That you're different from me
Yes, I can tell

আমার তো মনে হচ্ছে এটা ভিনগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সিডের উপলব্ধি। কেন বলছি জানো? এই গানের ঠিক চব্বিশ নম্বর লাইনে গিয়ে সিড লিখছে—

Yes, you're spinning around
And around in a car
With electric lights
Flashing very fast

এ বার বলো, কী মনে হচ্ছে? আক্ষরিক ভাবে যদি ভাবো, কবিতা বা ভাষ্যরীতি বাদ দিয়ে যদি পড়ো, গাড়িতে তো চরকির মতো ঘোরা যায় না! যায় ইউএফও-তেই! আবার বলেছে— বৈদ্যুতিক আলো দ্রুত ঝলকাচ্ছে? কেন? কারণ কী? এই বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু ইউএফও সাইটিং-এর বর্ণনারই মিল পাবে তুমি!

(ক্রমশ)

ছবি: রৌদ্র মিত্র

মিশু

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

কৃত্রিম চামড়া, চুল ও পোশাকে নিজেকে এক মধ্যবয়সি মহিলার সাজে সাজিয়ে তুলেছে সদ্য জেগে-ওঠা যন্ত্রটা— "আমরা তৈরি।" বাঙ্কারের এক পাশে হলঘরটার মধ্যে অজস্র কাচের কিউবিকল। তার চোখ সে দিকে ধরা। সেখানে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোকে পুতুলের মতো দেখায়। তাদের ঠোঁটে হাসি, কান্না, অভিমান। ওরা স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের

মধ্যেই একটা সুন্দর শান্ত পৃথিবীতে ওদের বেড়ে ওঠা...

হঠাৎ এগিয়ে এসে মহিলার হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন জেনারেল সিংহ, "আজ শেষ যুদ্ধ আমাদের। এর পর, আপনি ওদের দেখবেন মিলি।"

উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে তাঁর চোখে চোখ রাখলেন এম-আই-এল-০১ ওরফে মিলি, "নিশ্চিন্ত থাকুন, মাস্টার। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। সভ্যতার পরবর্তী তরঙ্গের জন্য এদের তৈরি করব আপনার দেখানো পথেই।"

অপেক্ষমাণ লিফটে ঢুকে এলেন জেনারেল সিংহ। তাঁকে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ভূপৃষ্ঠের দিকে উধাও হল লিফট।

"মা, সাতটা বাজে। স্কুলের ডাক আসবে কিন্তু এক্ষুনি। খেতে দেবে না?"

মা আঁকা ফেলে ঘুরে তাকালেন। এখন শরৎকাল। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চার পাশ ছবির মতো সুন্দর। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর মায়ের আঁকা ছবিগুলো। কী সুন্দর সব কল্কা, পাখি, পদ্মফুল!

"মিশু, সবে তো সোমবার এলি। আজকেই চলে যাবি?" মা একটা ফিঙে পাখির ডানায় নীল রং ভরতে ভরতে বললেন।

তার পর তুলিটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, "তার চেয়ে এই ছবিটা শেষ কর না! তার পর দু'জন মিলে খেয়েদেয়ে..."

মিশু হাসল, "যাব না বললেই হল? আজ আমার পরীক্ষার রেজ়াল্ট বেরোবে যে! ওই জন্যেই তো রেজ়াল্টের আগে মিলি ম্যাম তিন দিন ছুটি দিল তোমার কাছে এসে থাকার। তা ছাড়া মিলি ম্যামের ডাক এলে..."

"আমি যদি তোকে জোরসে জড়িয়ে ধরে থাকি তা হলে..." কথাটা শেষ না-করেই থেমে গেলেন মা। সেটা সম্ভব নয়। ডাকটা এলে যেতেই হয়।

"অমনি দুঃখ হয়ে গেল?" মিশু হাসল, "এখনও একটু সময় বাকি আছে। চলো, আমরা তত ক্ষণ..." বলতে বলতেই হঠাৎ তার পিঠের উপর রামধনু রঙের দুখানা ডানা খুলে যাচ্ছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে ডানার ঝাপটায় ভেসে উঠছিল মিশু...

পায়ের নীচে ছোট হয়ে আসছে তাদের গ্রামটা...ছোট ছোট ঘরবাড়ি, চাষের খেত, সুতোর জালের মতো নদী... তাদের গায়ে সকালের রোদের ওম...

আর ঠিক তক্ষুনি মিশুর মাথার মধ্যে মিলি ম্যামের গলাটা বেজে উঠল। ওর নাম ধরে ডাকছেন। কোত্থেকে কেমন করে যে ডাকেন, কে জানে!

ডাকটা মাথায় এসে ধাক্কা দিতেই, প্রতি বারের মতোই, হঠাৎ এক রাশ অন্ধকার এসে তাকে ঘিরে ধরল। আকাশ, বাতাস, পায়ের নীচের ছবিটা, মা, সব কিছু মুছে গেল চোখের পলকে...

অন্ধকারটা সরে যেতেই চার দিকে দেখে নিল এক বার সে। সামনেই ক্লাসরুমের সার সার চেয়ারে একের পর একে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসছে অলিনা, চ্যাং, সুন্দর... হইচই চলছে খুব।

ক্লাসরুমের এক কোণে এসে একলা একটা ডেস্কে বসল মিশু। গত চারটে বছর ধরে কেউ বসে না ওর পাশে। আসলে সবাই ওকে একটু এড়িয়েই চলে। ওর 'অসুখ' কিনা! অলিনা, চ্যাং-রা হেসে হেসে বলে, "মিশুর মাথায় পোকা।"

অথচ, আগে এমনটা ছিল না! সবার সঙ্গে এক সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল স্কুলের সময়টা! তার পর এক দিন, চার বছর আগে... বাড়িতে...

দিনটা আজও মিশুর মনে পড়ে। বর্ষার শুরু। ইশকুল থেকে ফিরে মিশু দেখে, মা উঠোনে বসে ছবি আঁকছেন। নদীর ছবি। নদীটার জলে মা নীল রং লাগানো শুরু করেছেন সবে, ঠিক তক্ষুনি একটা মেঘের টুকরো কোত্থেকে উড়ে এসে বৃষ্টি ফেলতে শুরু করল। মা তাড়াতাড়ি ছবিটা গুটিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একটা বড়ো জলের ফোঁটা এসে নদীটাকে একদম ধেবড়ে দিয়ে গেল। দেখে মিশুর যে কী ভীষণ কষ্ট হয়েছিল! ছবিটার দিকে তাকিয়ে সে প্রাণপণে মনে মনে বলল, "ঠিক হয়ে যা... ঠিক হয়ে যা..."

আর তক্ষুনি একটা ম্যাজিক হয়ে গেল যেন। উল্টো দিকে চালানো সিনেমার মতোই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আকাশের দিকে চলে গেল, মেঘগুলো সাঁই সাঁই করে কোথায় মিলিয়ে গেল, ফের সূর্য মুখ বাড়াল। আর, মা হাঁ করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেটাও ফের আগের মতো হয়ে গেছে। একটুও ধেবড়ে নেই!

আর সঙ্গে সঙ্গেই একদম অসময়ে তার মাথার মধ্যে মিলি ম্যামের ডাক ভেসে এসেছিল। সে চমকে উঠে দেখেছিল, মা-বাড়ি-গ্রাম সব মিলিয়ে গিয়ে সে স্কুলের টিচার্স রুমে বসে আছে।

মিলি ম্যাম দেখা গেল, বৃষ্টিকে উল্টোপথে পাঠানোর ঘটনাটা জেনে ফেলেছেন। প্রথমে তো তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সবটা শুনলেন। তার পর স্কুল-সাইকোলজিস্ট বীথিদি আবার তাকে হরেক রকম প্রশ্নটশ্ন করলেন... আগে কখনও এমন হয়েছে নাকি, তার কী কী ইচ্ছে হয়... এই সব। তার পর হসপিটাল রুমে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় একটা লাল-নীল আলোজ্বলা গামলা পরিয়ে দিয়ে, কী সব দেখে-টেখে বেজায় গম্ভীর হয়ে খস খস করে একটা কাগজে কী সব লিখে মিলি ম্যামের হাতে গুঁজে দিলেন। মিশুকে বললেন, নাকি ভীষণ এক ছোঁয়াচে মনের অসুখ হয়েছে তার।

সেই থেকে মিশুর দুঃখের দিন শুরু হল। ইশকুলের অন্য ধারে আর- একটা ছোট ইশকুল। চার পাশে তার উঁচু দেয়াল। সেইখানে সে একলা থাকে। সপ্তাহে এক

দিন বাড়ি যেতে পায়। বাকি দিনগুলো ওইখানে বসে বসেই সুমিত স্যার, সুব্রত স্যার, সিরি ম্যাম, বীথি ম্যামদের কাছে তার স্পেশ্যাল ক্লাস। সেই নাকি তার 'চিকিৎসা!'

দেওয়ালের ও পাশে যখন আর সবাই মজা করে চাষ, মাছ ধরা, কাপড় বোনা,

বনের গাছ-গাছড়া চেনার ক্লাস করে, মিশু তখন তাদের হইচই শুনতে শুনতে একলা একলা বসে এক-এক জন টিচারের কাছে বেজায় শক্ত শক্ত সব জিনিস পড়ে। নাকি ওতেই সে আবার ভাল হয়ে যাবে। মাঝেমধ্যে স্কুলের অন্যদের সঙ্গে একটা-দুটো ক্লাসেও তাকে বসতে দেয়া হত অবশ্য। যেমন সিরি ম্যামের এই বাংলা ক্লাসটায়। তাও অন্যদের চেয়ে খানিক দূরে। তবে সে আর কতটুকু!

কত বার মিশু বীথিদিকে বলেছে, তার রোগটা তিনি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দিতে। বীথিদি শুনে হাসেন, আর বলেন, "চিকিৎসা চলছে। সময় নেবে।"

প্রথম প্রথম মিশু বীথিদিকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু আজকাল, খানিক বড় হয়ে গিয়ে, তার সন্দেহ হয়। যতই বীথিদি আশ্বাস দিন, রোগটা তার বেড়েই চলেছে চার বছর ধরে। মিশু এর নাম রেখেছে 'ইচ্ছে রোগ।' বাড়িতে যখন থাকে, তখন মাঝেমধ্যেই খুব জোর করে কিছু ইচ্ছে করলে, দেখা যায় সেটা সত্যি হয়ে যাচ্ছে। সেই মায়ের ছবিটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর, এক দিন মিশু বাড়ি গিয়ে দেখে, তার পোষা টিয়াটা মরে গেছে। দেখে, কাঁদতে কাঁদতে যেই না ভেবেছে ও বেঁচে উঠুক, ওমনি সে নড়েচড়ে উঠে ডানা ঝাপটে এসে তার কাঁধে বসে পড়ল। যেন কিছুই হয়নি। এমনি আরও কত কিছু! আজকাল আর বেশি জোর করেও ভাবতে হয় না। সামান্য একটু ইচ্ছে হলেই কাজ হয়ে যায়। সেদিন যেমন, বাড়ি এসেই হঠাৎ মজা করে ভাবল, মায়ের যদি গোঁফ থাকত। অমনি পাশের ঘর থেকে মায়ের চিল-চিৎকার, "মিশু এলি? শিগগির উল্টো ইচ্ছে কর মা। নইলে লজ্জায় যে আমি..."

অথচ ইশকুলে যত ক্ষণ সে থাকে, তত ক্ষণ হাজার চেষ্টা করলেও কিচ্ছু হয় না। একলা একলা বসেই কত বার ভীষণ ইচ্ছে করেছে মিলি ম্যাম তাকে সবার সঙ্গে ক্লাসে বসতে দিন রোজ। কিন্তু কোথায় কী?

"আজ আমরা একটা কবিতা পড়ব।"

হঠাৎ সিরি ম্যামের গলা এসে তার চিন্তাটাকে সরিয়ে দিল। বোর্ডে একটা কবিতা লিখে দিয়ে বলছেন, "আমি সুর করে বলছি। তোরা আমার সঙ্গে বল। আমাদের পৃথিবীটাকে নিয়ে কবিতা—'ধনধান্যপুষ্পভরা/ আমাদের এই বসুন্ধরা..."

কথাগুলোতে ভারী মন-কেমন করা একটা সুর ভরে দিচ্ছিলেন সিরি ম্যাম। সুরটা সবার গলায় ছড়িয়ে যাচ্ছিল...

কী সুন্দর! মিশুর চোখের সামনে ছবিগুলো ভেসে উঠছিল যেন। এ তো তার বাড়ির গল্প! যেখানে সে তার মায়ের সঙ্গে থাকে! তার চার পাশে কত ফুল, মাঠঘাট, আকাশ, পাখি..."

এই স্কুলবাড়িটায় আকাশ, পাখি, সূর্য কিচ্ছু নেই। মাথার উপর পুরু সিমেন্টের ছাদ। খোপ খোপ ক্লাসরুম। পাহাড়, নদী, মাঠ, বনের ছোট ছোট মডেল... ধুৎ!

যেতে যেতেই একটা অজানা আশঙ্কা জাগছিল তার মনে। আসলে, তার 'ইচ্ছে রোগ'-এর যে চিকিৎসাটা চলেছে গত চারটে বছর ধরে, সেটা ভারী অদ্ভুত। একটা 'স্পেশ্যাল কোর্স'। বীথিদি তাকে বুঝিয়েছিলেন, এতে একটা লম্বা সময় ধরে এক রূপকথার দুনিয়ার খবর শিখতে হবে তাকে। তাতেই নাকি তার অসুখ সারবে।

আধ ঘণ্টার ক্লাস। শেষ হয়ে যেতে সবাই হই হই করে ছুটল বাইরে হাইড্রোপনিকস খেতের দিকে। সেখানে এ বার তাদের চাষ শেখার ক্লাস। আর মিশু চলল তার বন্দিশালার দিকে।

যেতে যেতেই একটা অজানা আশঙ্কা জাগছিল তার মনে। আসলে, তার ইচ্ছে রোগ-এর যে চিকিৎসাটা চলেছে গত চারটে বছর ধরে, সেটা ভারী অদ্ভুত। একটা 'স্পেশ্যাল কোর্স'। বীথিদি তাকে বুঝিয়েছিলেন, এতে একটা লম্বা সময় ধরে এক রূপকথার দুনিয়ার খবর শিখতে হবে তাকে। তাতেই নাকি তার অসুখ সারবে। সে-ও লক্ষ্মী মেয়ের মতো তাঁদের সব কথা শুনেছে। একটা অবাস্তব কল্পনার জগৎ। সেখানে তার মতো মানুষদেরই রাজত্ব। কিন্তু সে ভারী অবিশ্বাস্য রূপকথা। তার কথা জানতে গিয়ে গত চার বছর ধরে এক দিকে সে সে-দুনিয়ার চার-পাঁচটা ভাষা শিখেছে, তার আশ্চর্য জাদুকরী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতির পাঠ নিয়েছে। আবার তার পাশাপাশিই ভয়ে হিম হয়ে গিয়ে দেখেছে, শুনেছে তাদের ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধ, মৃত্যু, দম আটকানো বিষাক্ত হাওয়া আর জলের খবর। বিশেষ করে 'হিরোশিমা' নামের সেই বুক ক্রিস্টালটা! ভিডিয়ো বইটায় মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যুর সে যে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল...

এ বার ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আগে, সাত সাতটা দিন ধরে তার পরীক্ষা নিয়েছেন মিলি ম্যাম। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা, পাশাপাশি হাইড্রোপনিকস, সৌরবিদ্যুৎ তৈরির প্ল্যান্ট, আইনকানুন... এই যা কিছু সে শিখেছে এত দিন ধরে সেই সব কিছুর উপরে তার পরীক্ষা নিয়েছেন। অবশেষে তিনি বলেছেন, তার স্পেশ্যাল কোর্স শেষ। তার পর একেবারে তিন দিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। বলেছিলেন, "বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে খুব আনন্দ করে আয় তুই।"

আজ তার গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি। অথচ অসুখটা তো তার সারল না! আজ সকালেও তো সে ইচ্ছে হতেই পিঠে ডানা ছড়িয়ে মাকে নিয়ে...

তা হলে? এর পর তবে কোথায় যাবে সে? এমন একটা অদ্ভুত অসুখ বয়ে নিয়ে, সবার চোখে 'মাথায় পোকা মিশু' হয়ে সে কেমন করে...

"মিশু!"

কখন যেন ঘেরা জায়গাটার মধ্যে এসে পৌঁছেছে সে। চার পাশে মাথা ঘুরিয়ে দেখল মিশু। মিলি ম্যাম, সিরি ম্যাম, বীথি ম্যাম, সুমিত স্যার, সুব্রত স্যার সব্বাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। সবার মুখে হাসি।

হঠাৎ করেই কেমন একটা নৈঃশব্দ্য ছেয়ে গিয়েছে তখন চার দিকে। মিশু খেয়াল করছিল দেওয়ালের বাইরে থেকে আর ছেলেমেয়েদের হইচই-এর কোনও শব্দ উঠছে না।

'কিন্তু এখন তো স্কুল ছুটির সময় নয়? তা হলে?' কৌতূহলী চোখে মিলি ম্যামের দিকে তাকাল মিশু। মিলি ম্যাম হাসলেন, "তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি আমি। শুধু

এটাই নয়, গত চার বছর ধরে অজস্র প্রশ্ন জেগেছে তোমার মনে। তবে তার আগে, এই বুক ক্রিস্টালটা তুমি দেখো। তার পর, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। এ বার তুমি প্রস্তুত।"

ম্যামের বাড়িয়ে-ধরা ক্রিস্টালটা হাত পেতে নিল মিশু। তার পর তাতে হালকা একটা ঝাঁকুনি দিতে সেটা গুন গুন করে উঠে বাতাসে একটা ভিডিয়োর হলোগ্রাম ছড়িয়ে দিল তার সামনে।

পাতাটায় তাদের স্কুলটার একটা চলন্ত ছবি... সেখানে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা এক জন মানুষ। তাঁর সামনে দেওয়ালের খোপ থেকে বেরিয়ে আসা যন্ত্রটা একটা খোলা বাক্স থেকে কৃত্রিম চামড়া, চুল ও পোশাকে নিজেকে এক মধ্যবয়সি মহিলার সাজে সাজিয়ে তুলেছিল...

সেদিকে তাকিয়ে একটু তীক্ষ্ণ শ্বাস টেনে নিল মিশু। একে সে চেনে...

মিলি ম্যাম! তিনি...

ছবির পর ছবি ভেসে যায় বাতাসে। মাটির অনেক নীচে একটা বাঙ্কার। সেখানে একটা বিরাট স্কুল। তাদের স্কুল! মিলি ম্যামের হাতে তার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন মিলিটারি পোশাক পরা মানুষটা। তার একটা ঘরে... কাচের কফিনে সার সার ঘুমন্ত শিশু... এই বার বাঙ্কারের এক পাশে একটা লিফটের দরজা খুলে গেছে। মিলিটারি পোশাক পরা মানুষটা সেখানে উঠে...

"আপনি... আপনারা... মানুষ নন? যন্ত্র? আপনারা..."

মিলি ম্যাম এগিয়ে এসে সস্নেহে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ঠোঁটে এক টুকরো হাসি, "উঁহু। যন্ত্র আমি একাই। এম-আই-এল-০১, সংক্ষেপে মিলি। বাকি এরা সব মানুষ, মিশু। তোমার মতোই এরাও বিশেষ শক্তির অধিকারী। তোমার মতোই এরা আমার কাছে চার বছরের বিশেষ ট্রেনিং পাওয়ার পর সত্যিটাকে জানার উপযুক্ত হয়েছে। এসো... তোমাকে অনেক কিছু দেখানোর আছে যে!"

বাইরে স্কুল শেষ। হাইড্রোপনিকসের খেত জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ছাত্রদের শরীরগুলো। তাদের একে একে তুলে নিয়ে এসে একটা বিরাট হলঘরে কাচের কফিনে শুইয়ে দেয় বুদ্ধিমান যন্ত্রের দল। বাঙ্কারের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লিফটটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সেদিকে দেখিয়ে মিলি ম্যাম হাসলেন, "কাল স্কুলের জন্য জেগে ওঠার আগে পর্যন্ত ওরা ঘুমোবে। ঘুমের মধ্যে একটা সুন্দর পৃথিবী, বাপ-মা'র আদর সেই সব কিছুতে ডুবে থাকবে ওরা এ বার আগামী আঠারো ঘণ্টা। যেমন তুমিও থাকতে এক সময় প্রতি দিন।"

বলতে বলতেই তাঁর হাতের ইশারায় বাতাসে মিলির চির চেনা গ্রামটার ছবি ফুটে উঠছিল। সেদিকে দেখিয়ে মিলি ম্যাম বলছিলেন, "এই গ্রাম, তার রোদ-বৃষ্টি, তোমার মা... এই সব কিছু আমারই প্রোগ্রাম করা স্বপ্ন, মিশু। এই বাঙ্কারের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য একটা করে স্বপ্ন বানানো আছে। দিনের আঠারো ঘণ্টা সেই স্বপ্নে তারা ডুবে থাকে। আর ছ'ঘণ্টা জেগে থেকে এই বাঙ্কারের স্কুলে আসল জীবনের পাঠ নেয়।"

"আসল জীবনের পাঠ?"

ওদের নিয়ে ততক্ষণে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসেছে লিফটটা। তার সামনের পুরু কাচের আবরণ দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। ধূসর, ছাইয়ে ঢাকা একটা নিষ্প্রাণ দুনিয়া। সেদিকে ইশারায় দেখালেন মিলি ম্যাম, "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মিশু। এক জন মানুষও বাঁচেনি, তোমরা ক'জন ছাড়া। ধ্বংস নিশ্চিত জেনে জেনারেল অতীশ সিংহ, মাটির নীচের এই বাঙ্কারে গড়েছিলেন 'প্রজেক্ট ডুম্‌স-ডে ব্যাক-আপ'। গড়েছিলেন আমাকেও। সারা দুনিয়া থেকে কিছু অনাথ শিশুকে এনে সেইখানে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ভবিষ্যতের বীজ হিসেবে।

"পৃথিবীর বাতাসে বিকিরণের বিষ কাটতে আরও বিশ বছর লাগবে। আর তার পর, এখানে নতুন করে শুরু করার জন্য, ফসল ফলানোর জন্য, গান গাওয়ার জন্য ওরা মাটির গভীরের এই বাঙ্কারে আমার কাছে তৈরি হচ্ছে, মিশু। ওই তাদের আসল জীবনের পাঠ।"

"আ... আর আমি? আমাকে কেন তবে অন্য শিক্ষায়..."

"বলছি। যে স্বপ্নের প্রোগ্রামে তোমরা বাড়িতে বাপ-মায়ের আদরে দিন কাটাও, খুব কম মনই তার প্রোগ্রামিংকে অস্বীকার করার শক্তি ধরে। এত কালের মধ্যে কেবল মাত্র বীথি, সিরি, সুমন আর সুব্রত সে কাজ করে দেখিয়েছে। তার পর এক দিন দেখলাম, তুমি স্বপ্নের মধ্যে নিজের ইচ্ছের জোরে প্রোগ্রামিংয়ে বৃষ্টির একটা ইলিউশনকে ডিলিট করে দিতে পেরেছ। বুঝলাম, তুমিও ওদের মতোই। আলাদা। এ তোমার অসুখ ছিল না মিশু। ছিল তোমার মস্তিষ্কের অসামান্য শক্তির প্রমাণ।

"অকল্পনীয় শক্তিধর মনের অধিকারী তোমরা এই কয়েক জন, তোমাদের অন্য কাজ আছে, মিশু। তোমাদের গড়ে তোলা হচ্ছে, নতুন পৃথিবীতে এদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। আর সেই জন্যই আগের সভ্যতার সমস্ত জ্ঞান, তার ইতিহাস, তার ভালমন্দ, ঠিক-ভুল... সেই সব কিছুকে শিখতে হয়েছে তোমাকে! আর এ বার, এই 'ঘুম অকাদেমি'-র আর-এক জন শিক্ষক হয়ে তুমি ভবিষ্যতের পৃথিবীর এই নাগরিকদের গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাবে।"

"আ... আমার মা? আ... আমার বাড়ি?"

মিলিম্যাম মাথা নাড়লেন, "সব রইল তোমার স্বপ্নের প্রোগ্রামে। তোমার মৃত সত্যিকার মায়ের আদলেই তোমার স্বপ্নের মাকে কোড করেছিলাম আমি, মিশু। এ বার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে করতে করতে করতে যখন ক্লান্ত হবে, তখন সেই স্বপ্ন-প্রোগ্রাম অ্যাক্সেস কোরো তুমি। মায়ের কাছে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে এসো।"

ওরা চলে গেছে নিজেদের কোয়ার্টারে। একলা যন্ত্রটা এই বার নিজের শরীর থেকে খসিয়ে এনেছে মানুষের ছদ্মবেশ। তার পর বুকের একটা বোতামে চাপ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা হলোগ্রামটার দিকে চোখ রেখে সে নিজের মনেই বলল, "আপনার দিয়ে যাওয়া দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে চলেছি আমি জেনারেল সিংহ। কথা দিচ্ছি, এক দিন ফের আপনাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে পৃথিবীটাকে ফিরিয়ে দেবে আপনার সৃষ্টি এই যন্ত্র। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

অ্যাপোলোর মন্দির এবং ট্রেজ়ারি অফ অ্যাথেনিয়ান্স

ডেলফির অন্দরে

গ্রিসের তিন হাজার বছরের পুরনো অ্যাপোলোর উপাসনা মন্দির ঘুরে লিখেছেন **পারমিতা দাশগুপ্ত**

অক্টোবরের এক ঝকঝকে সকালে হিমেল হাওয়া গায়ে মেখে গ্রিসের পারন্যাসাস পাহাড়ের কোলে ডেলফির ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে পৌঁছোলাম আমরা। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো এই জায়গাটির পোশাকি নাম 'স্যাংচুয়ারি অফ ডেলফি'। গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর উপাসনা মন্দির এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বেশ কিছু স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে গোটা স্যাংচুয়ারি জুড়ে। সেই ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে রেখেছে ঘন সবুজ অলিভ গাছে ঢাকা পারন্যাসাস পাহাড়। পাহাড় পেরোলেই হাতের নাগালে করিন্থিয়ান উপসাগরের গাঢ় নীল জল।

অ্যাথেন্স থেকে উত্তর-পুবে প্রায় দুশো কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে যিনি নিয়ে এলেন আমাদের ডেলফিতে, সেই দীর্ঘকায়, হাসিখুশি, মধ্যবয়সি মানুষটির নাম নিকোলাস। ঝুলিতে তাঁর ইতিহাস আর পুরাণের আশ্চর্য সব গল্প। তাঁর কাছেই জানা গেল, পৃথিবীর মধ্যবিন্দুটিকে খুঁজে বের করার জন্য দেবতাদের রাজা জিউস নাকি পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে পুবে আর পশ্চিমে উড়িয়ে দিয়েছিলেন দুটো ইগল পাখি। একই গতিতে উড়ে চলা পাখি দুটো অর্ধেক পৃথিবী পরিক্রমা করে শেষমেশ মিলল এসে এই ডেলফিতে। সেই থেকে গ্রিকদের বিশ্বাস ডেলফিই হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র বা 'ন্যাভল অফ দ্য আর্থ'। তবে ডেলফির নামডাকের এইটিই কিন্তু আসল কারণ নয়। সেই প্রাচীন গ্রিসে ডেলফি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল মূলত তার

বিস্ময়কর ক্ষমতা। এখানে বলে রাখি, পাইথিয়া কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, ওই মন্দিরে যিনিই প্রধান পুরোহিত হতেন, তাঁকেই বলা হত পাইথিয়া। আসলে ডেলফির এই অ্যাপোলো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে সব সময়ই বেছে নেওয়া হত কোনও না-কোনও মহিলাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি হতেন ডেলফিরই অধিবাসী। গ্রিসের মানুষের বিশ্বাস ছিল দেবতা অ্যাপোলোই নাকি তাঁর হেঁয়ালি-মেশানো ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতেন পাইথিয়ার উচ্চারণে আর সে ভবিষ্যদ্বাণী মিলেও যেত একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। দূর-দূরান্ত থেকে সাগর পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষ আসতেন এখানে নিজের ভবিষ্যৎ জানতে। এত কষ্ট করে এসেও কিন্তু পাইথিয়ার সঙ্গে সরাসরি দেখা করে কথা বলতে পারতেন না তাঁরা। আর এক পুরোহিতের মাধ্যমে চলত কথোপকথন। অনেকে মনে করেন আসল কলকাঠিটি নাকি নাড়তেন এই পুরোহিতমশাই। নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী পাইথিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা দিতেন তিনি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ওই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজারাজড়া পর্যন্ত সকলেরই ছিল অগাধ আস্থা। শুধু ব্যক্তিগত বিষয়েই নয়, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাইথিয়ার দৈববাণীর উপর অনেকটাই

ট্রেজ়ারি অফ অ্যাথেনিয়ান্স
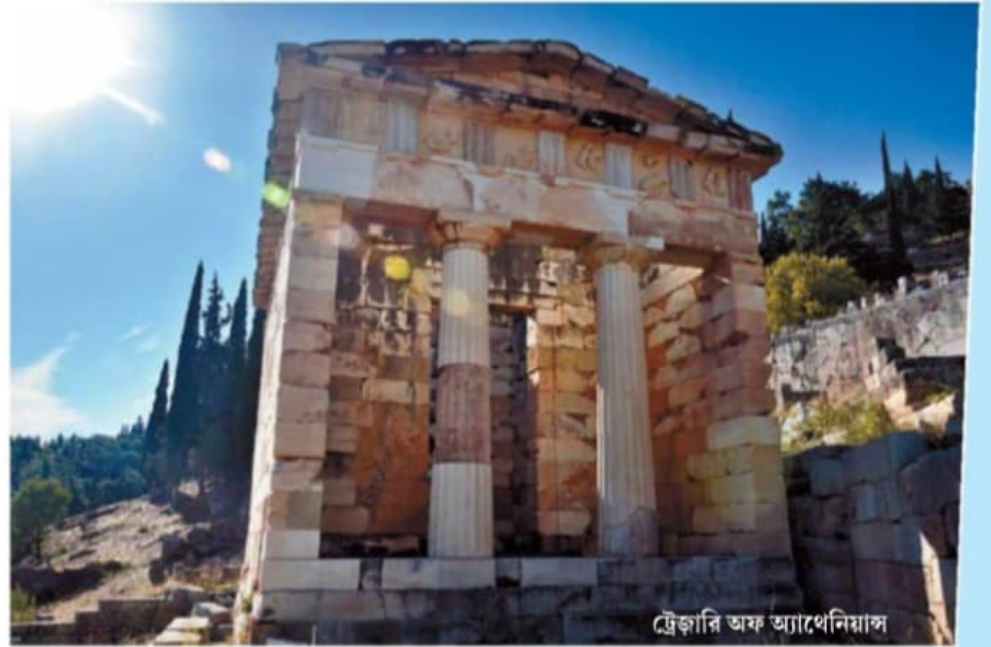
অ্যাপোলো মন্দিরটির জন্য। ডেলফির গোড়াপত্তনের সময় কিন্তু এই মন্দিরের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাস আর পুরাণ ঘেঁটে পাওয়া তথ্য বলছে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে ডেলফি যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল, তখন এখানে ছিল পৃথিবীর দেবী গেইয়ার একটি মন্দির। সে মন্দির পাহারা দিত গেইয়ার সন্তান পাইথন। এই পাইথনকে হত্যা করে সেই জায়গায় নিজের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন জিউস-পুত্র, আলোর দেবতা অ্যাপোলো। জিশু খ্রিস্টের জন্ম নিতে তখনও প্রায় আটশো বছর বাকি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু দিনের মধ্যেই দেশে-বিদেশে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। খ্যাতির কারণ, এই মন্দিরের মহিলা পুরোহিত পাইথিয়ার ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার
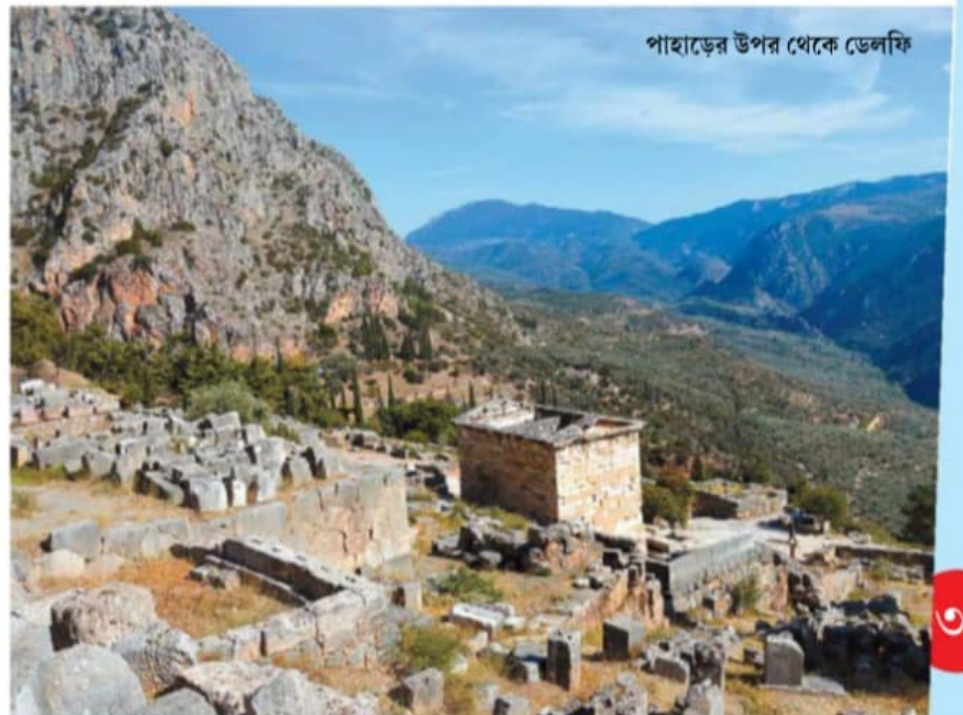
পাহাড়ের উপর থেকে ডেলফি

নির্ভর করতেন সেই আমলের রাজা এবং ক্ষমতাসীন মানুষেরা। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ডেলফির দখলদারি নিয়ে আশপাশের সিটি স্টেটগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে গেল লড়াই। মধ্য গ্রিসের ফোসিয়ান রাজবংশ থেকে শুরু করে ম্যাসিডোনিয়ান, রোমান, বাইজেন্টাইন... কে না দখল নিয়েছে ডেলফির! শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ধাক্কাই নয়, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং ভূমিকম্পের মতো দু'-দুটো বড়সড় বিপর্যয়ও সামলাতে হয়েছে ডেলফিকে। এ সব ওঠাপড়া সত্ত্বেও ডেলফির খ্যাতি অটুট ছিল বেশ কয়েকশো বছর। শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে এসে ডেলফি ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক ধ্বংসস্তূপে।
টিকিট কেটে গেট পেরিয়ে স্যাংচুয়ারির ভিতরে ঢুকতে গিয়ে প্রথমেই চোখ চলে গেল যে দিকে, সেটি অলিন্দ ও থামে ঘেরা, পাথরে বাঁধানো এক আয়তাকার চত্বর— নাম তার 'রোমান অ্যাগোরা'। রোমান আমলে গড়ে ওঠা এই চত্বরটিতে সম্ভবত বসত একটি খোলা বাজার। নিকোলাস জানালেন, ক্যাস্টেলিয়া স্প্রিং নামে এক পবিত্র ঝর্নার জলে স্নান করে, শুদ্ধ হয়ে তবেই দেশবিদেশ থেকে আসা দর্শনার্থীরা প্রবেশ করতেন স্যাংচুয়ারি চত্বরে। তার পর এই রোমান অ্যাগোরা থেকে পুজোর উপকরণ আর উপঢৌকন সংগ্রহ করে 'ভিয়া সাক্রা' ধরে রওনা দিতেন তাঁরা মন্দিরের পথে।
পাথরে বাঁধানো এই 'ভিয়া সাক্রা' বা 'সেক্রেড ওয়ে' ছিল স্যাংচুয়ারির প্রধান সড়ক— একেবেঁকে, ধাপে ধাপে পথটি উঠে গেছে উপরে, অ্যাপোলোর মন্দির পর্যন্ত। ওই পথ ধরে আমরাও উঠতে শুরু করলাম। এক সময় নাকি এই পথের দু'পাশে ছিল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ, কারুকার্য-খচিত নানা মূর্তি। সময়ের অভিঘাতে এদের বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলো বেঁচেবর্তে ছিল, তাদেরও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ডেলফি মিউজ়িয়ামের নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন এখানে পড়ে আছে শুধু তাদের ভাঙাচোরা ভিত্তিপ্রস্তর। এ ছাড়া পথের দু'পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেজ়ারি বা কোষাগারের ধ্বংসাবশেষ— 'ট্রেজ়ারি অফ সিফনোস', 'ট্রেজ়ারি অফ অ্যাথেনিয়ান্স', 'ট্রেজ়ারি অফ সিরাকিউস'। ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেলে বিভিন্ন সিটি স্টেটের শাসকেরা মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে আসতেন মন্দিরে এবং সেই সব সামগ্রী নিরাপদে রাখার জন্য তৈরি করে দিতেন ট্রেজ়ারি। এদের মধ্যে চোখে পড়ার মতো হল 'ট্রেজ়ারি অফ অ্যাথেনিয়ান্স'। বিখ্যাত ম্যারাথন যুদ্ধে গ্রিকদের সাফল্যের স্মারক এই স্থাপত্যটি আজও অনেকটাই অক্ষত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিয়া সাক্রার কোল ঘেঁষে, অ্যাপোলো মন্দিরের ঠিক নীচে।
ডেলফির গেট থেকে প্রায় দুশো মিটার চড়াই ভেঙে তবে পৌঁছোলাম এখানকার মূল আকর্ষণ অ্যাপোলোর মন্দিরে। স্যাংচুয়ারির একেবারে কেন্দ্রে এর অবস্থান। দু'-দু'বার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৃতীয় বার গড়ে তোলা হয়েছিল যে মন্দির, তারই ভগ্নাবশেষ আজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাহাড়ের ঢালে। ভগ্নাবশেষ বলতে অবশ্য শুধু মন্দিরের ভিত এবং হাতে গোনা গোটা কয়েক স্তম্ভ। আড়াই হাজার বছরের ঝড়-ঝাপটা সামলে ক্ষয়প্রবণ চুনাপাথরে তৈরি

ডেলফির থিয়েটার

মন্দিরটি তার এটুকু অংশই মাত্র বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। বিশাল আয়তক্ষেত্রাকার ভিতটি বহুভুজাকৃতি পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সে পাথরে কোথাও কোথাও লেখা আছে প্রাচীন লিপি। এই মন্দিরের একেবারে শেষ প্রান্তে 'অ্যাডিটন' নামের একটি ছোট্ট ঘরে এক উঁচু আসনে বসে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতেন পাইথিয়া, সেখানে সাধারণের প্রবেশ ছিল বারণ। সম্ভবত ঘরটির নীচে ছিল একটি প্রাকৃতিক গিজ়ার। তাই ওই ঘরের মেঝের ফাটল দিয়ে মাটির নীচ থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসতো গরম বাষ্প আর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার আড়ালে আবছা হয়ে আসা পাইথিয়ার অপার্থিব অবয়ব দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চারণ করত দৈববাণী— তৈরি হত এক অলৌকিক আবহ।

অ্যাপোলোর মন্দিরের ঠিক উপরেই পাহাড়ের ঢালে ডেলফির বিখ্যাত থিয়েটার। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তৈরি এই থিয়েটারে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। গোলাকার মঞ্চ, নীচে অর্কেস্ট্রার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, মঞ্চ ঘিরে পাহাড় কেটে তৈরি পাথরের গ্যালারি। শহরের সংস্কৃতিমনস্ক নাগরিকদের উদ্যোগে এখানে প্রায়ই আয়োজন করা হত সঙ্গীতানুষ্ঠানের, বসত কবিতা পাঠের আসর, কান পাতলে শোনা যেত নাটকের কুশীলবদের সংলাপ উচ্চারণ। বলা হয় প্রাচীন গ্রিসের বিখ্যাত এপিডরাস থিয়েটারের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারত ডেলফির এই থিয়েটারটি। থিয়েটার ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছুটা উপরে পাহাড়ের মাথায় ৬৭২ মিটার উচ্চতায় রয়েছে ডেলফির প্রাচীন স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের সামনে পৌঁছে চার পাশে তাকিয়ে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। বড় বড় সাইপ্রাস গাছের ছায়া ঘেরা কী স্নিগ্ধ, সবুজ পরিবেশ! আড়াই হাজার বছরের পুরনো এই স্টেডিয়ামটিতে প্রায় সাত হাজার লোকের বসার আসন রয়েছে। অ্যাপোলোর পাইথন হত্যাকে স্মরণে রেখে প্রত্যেক চার বছর অন্তর এই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হত পাইথিয়ান গেম। অলিম্পিক্সের পরে এইটিই ছিল প্রাচীন গ্রিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলাধুলোর আসর। খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হত এখানে। জেনে ভাল লাগল যে, সেই খ্রিস্টের জন্মের আগেকার কালেও গ্রিসের মহিলারা নিয়মিত অংশ নিতেন এই পাইথিয়ান গেমে।

অপূর্ব নিসর্গের মাঝে

রোমান অ্যাগোরা

স্টেডিয়ামটিই ডেলফির শেষ সীমানা। এ বার নামতে হবে নীচে। নীচে তাকালে চোখে পড়ে গোটা স্যাংচুয়ারির বিস্তার। ভাবতে অবাক লাগছিল যে মাত্র ছ'টি ডোরিক কলাম আর ভাঙাচোরা এক ভিত সম্বল করে দাঁড়িয়ে থাকা এই মন্দিরেই এক সময় নির্ধারিত হত গ্রিসের ভবিষ্যৎ। এখানকার দৈববাণীর উপর নির্ভর করে স্থির হত ভূমধ্যসাগরীয় রাজারাজড়ার নীতি, লেখা হত ক্ষমতার জটিল সমীকরণ। জানি না, এর কতটুকু সত্যি, কতটুকুই বা কল্পকাহিনি! শুধু এটুকু বুঝেছি, ডেলফি হল ইতিহাস আর পুরাণের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন— বাস্তব আর কল্পনার অবাধ মিলমিশ। এদের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা ভারী কঠিন। আর এই ব্যাখ্যাতীত আবছায়াটুকুই ডেলফির আসল আকর্ষণের জায়গা। আজ সারা দিন ধরে সেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া ইতিহাস আর কল্পনার খানিক সওদা ঝোলায় ভরে এ বার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ডেলফির গেট পেরিয়ে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আলোর দেবতার মন্দিরে তখন আশ্চর্য রঙের খেলা।

ফটো: লেখক

পার্কের মধ্যে পাথর

অঙ্কন মিত্র

কষ্ঠিপুর একটা সাদামাটা, মামুলি জনপদ। মেরেকেটে দুশো ঘর লোক বাস করে এখানে।

অঞ্চলে একটাই মাঝারি মাপের হাসপাতাল, আর পোস্ট অফিস আছে; থানা, আর রেল স্টেশনটা পাশের বড় শহর দেবসুন্দরপুরে অবস্থিত। দেবসুন্দরপুরে বড় হাট বসে। মজা নদীটাও ওখান দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে।

তাই ভৌগোলিক ভাবে বলা চলে, কষ্ঠিপুর নামক আপাত নিরিবিলি জনপদটা আসলে জমজমাট দেবসুন্দরপুরেরই একটা

নাগরিক সম্প্রসারণ মাত্র।

ইতিহাস ঘাঁটলে অবশ্য জানা যায়, কষ্টিপুরে অনেক কাল আগে, সম্ভবত আলমগির বাদশাহ দিল্লির মসনদে পাকাপাকি ভাবে বসার সময়েই, অঞ্চলের একটি কালো জলের পুকুরের তলদেশ থেকে এক জেলে, কষ্টিপাথরের কালো একটি বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি খুঁজে পান।

তখন খুব ধুমধাম করে পুকুরের পাশেই সেই মুরলীধারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং তদানীন্তন স্থানীয় জমিদারমশাই চটপট এই গ্রামের পুরনো হেঁজিপেঁজি নামটা বদলে, হঠাৎ পাওয়া কষ্টি-কৃষ্ণের নামেই গ্রামের নতুন নামকরণ করেন, কষ্টিপুর।

এ ঘটনার কতটা সত্যি আর কতটা কিংবদন্তি, তা আর জানাটানা যায় না। কারণ সেই কালো পুকুরটার অস্তিত্ব আজ আর নেই, নেই সেই পেল্লায় পুরনো জমিদারবাড়িটাও। তবে কষ্টিপুরের বংশীধারীর প্রাচীন মন্দিরটা আজও লোকে পরবে-সরবে দেখতে আসে।

লোকমুখেই শোনা যায়, এখানকার জমিদারবংশের শরিকরা নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়া, মামলা-মকদ্দমা করতেন। অবশেষে এক শরিক পার্শ্ববর্তী দেবসুন্দরপুর গ্রামে চলে যান এবং সেখানে তাঁরা নতুন করে দেবসুন্দর কৃষ্ণের বড় মন্দির নির্মাণ করেন। সেই পক্ষের বাড়বাড়ন্ততেই এখন দেবসুন্দরপুর জমজমাট হয়ে উঠেছে।

॥ ২ ॥

কষ্টিপুরের স্থানীয় পৌরপিতা খগরাজ গুণ প্রবীণ ও ভাল লোক। তিনি কষ্টিপুর চৌমাথার বাঁ দিকে, নিরিবিলি সড়কটার ঠিক পাশে, যেখান দিয়ে রাস্তাটা কষ্টিপুর ছেড়ে দেবসুন্দরপুরের মরা নদী-খাতের দিকে চলে গিয়েছে, সেইখানেই রাস্তার পাশের আগাছায় ভরা বড় জমিটাকে পরিষ্কার করে সুন্দর একটা পার্ক বানিয়ে দিয়েছেন।

কষ্টিপুরে আগে কোনও পার্কটার্ক ছিল না। এখন এই সুন্দর করে সাজানো পার্কটায় ছেলেপুলেরা বিকেলে খেলতে আসে, বয়স্করা প্রাতর্ভ্রমণ করেন, পাশের স্কুল থেকে ছাত্ররা এসে ড্রিল প্র্যাকটিস করে। এমনকি মাঝে-সাঝে দু'-একটা ফিল্ম-সিরিয়ালের শুটিং পর্যন্ত হয়। এই পার্কটার জন্যই এলাকার লোকে খগরাজবাবুকে ধন্য ধন্য করে।

পার্কটির নাম, 'কষ্টিপুর বন্ধুবিতান'। এটাও খগরাজবাবুরই দেওয়া। পার্কে ঢোকার মুখে গ্রিলের দরজার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাইনবোর্ডে নামটা লেখা আছে।

তবে পার্কের মধ্যে ঢুকে ডান দিকে কয়েক পা এগোতেই একটা বেশ চ্যাটালো, গন্ডারের পিঠের মতো মসৃণ, ধূসর ও বড়সড় পাথর চোখে পড়ে। অনেকে পার্কে এসে ব্যায়াম-জগিং করার পর, ক্লান্ত হয়ে ওই পাথরটার উপর বসেও পড়ে।

পার্কে এমনিতে বড় বড় গাছগুলোর তলায় লোহার সুন্দর কারুকাজ করা কয়েকটা লম্বা বেঞ্চি পাতা আছে। কিন্তু অনেকেই বেঞ্চির বদলে ওই পাথরটার উপর এসে বসতেই বেশি পছন্দ করে। ছেলের দলও ওই পাথরটাকে ঘিরেই লুকোচুরি থেকে লাট্টু ঘোরানো, সবই খেলে বেড়ায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ওই অত বড় পাথরটা পার্কের মধ্যে এল কোত্থেকে? ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে পার্কটা বানানোর সময়ও তো ওটা ওখানে ছিল না। তা ছাড়া এই সমতল বঙ্গের সাধারণ একটা জনপদ কষ্টিপুরে, রাতারাতি অমন বড় একটা পাথর এসে পড়লে, কেউ না কেউ তো ঠিক টের পেতই। কিন্তু এ পাথরটা যে মাস কয়েক আগে, কোত্থেকে পার্কের ঠিক ডান দিকের ওই রেলিংয়ের কাছে মাটি ফুঁড়ে, নাকি আকাশ থেকে নেমে এসে আপনা-আপনিই চুপটি করে বসে গেছে, সে সম্পর্কে কেউই বিশেষ কিছু বলতে পারে না। তবে পাথরটা থাকাতে পার্কে বেড়াতে আসা কারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে না বলেই, কেউ আর ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না।

॥ ৩ ॥

ওই ধূসর পাথরটার চ্যাটালো পিঠের উপর চেপে, পার্কের উঁচু রেলিংটাকে আঁকড়ে ধরে, কেউ যদি রাস্তার ওই পাড়ে সোজাসুজি তাকায়, তা হলে সে একটা নোনা-ধরা পুরনো বাড়ি, আগাছার বনজঙ্গলের মধ্যে থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাবে। ওটাই কষ্টিপুরের প্রাচীন জমিদারদের শরিকি বাড়ির অবশিষ্টাংশ। এখন ও বাড়িতে নির্মেঘচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে এক আধপাগলা বুড়ো থাকে।

ভদ্রলোক বহু দিন বিদেশে কাটিয়েছেন বলেই শোনা যায়। বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা আর অধ্যাপনা করতেন। মাথা একটুআধটু খারাপ হওয়ার পর, এখন দেশে ফিরে ওই ভাঙা বাড়িতে একাই থাকেন। কী যে করেন, একা একা ওই প্রাচীন প্রেতপুরীতে বসে, সে খবর কষ্টিপুরের কেউই প্রায় রাখে না।

তবে খগরাজবাবু এক বার যেচে আলাপ করে জেনেছিলেন, ভদ্রলোক নাকি মিথিকাল ক্রিপ্টোবায়োলজি বলে একটা আজব বিষয়ে গবেষণা করবেন বলেই হঠাৎ দেশে ফিরে এসেছেন। আগে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য উদ্ভিদবিদ্যার প্রফেসর ছিলেন।

খগরাজবাবুর ধারণা, মিথিকাল ক্রিপ্টোবায়োলজি বলে আদৌও কোনও সাবজেক্ট হয় না। ওটা ওই মাথা খারাপেরই একটা লক্ষণ।

তবে ওই অদ্ভুত পাথরটার মতো, এই নির্বিরোধী পাগলটাও কষ্টিপুরের শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রায় কোনও ব্যাঘাত ঘটায়নি বলেই, শরিকি বাড়ির নির্মেঘ-পাগলকেও সবাই এক রকমমেনেই নিয়েছে।

॥ ৪ ॥

কষ্টিপুরের মতো এমন একটা অখ্যাত জায়গার নাম হঠাৎ সে বার খবরের কাগজের পাতায় উঠেছিল। সেটাও এই কয়েক মাস আগের কথা।

খবরে প্রকাশ, 'পয়জন ফ্যাং' নামে একটা সামুদ্রিক চোরাকারবারির দল নাকি দক্ষিণ আফ্রিকার ছোট একটি বন্দর-শহরের স্থানীয় ব্যাঙ্কে ঢুকে টাকা ও হিরে হাতানোর সময়, স্থানীয় পুলিশের বিশেষ কমব্যাট-ফোর্সের হাতে ধরা পড়ে যায়। এই সময় দ্বিপাক্ষিক গোলাগুলিতে কয়েক জন দুষ্কৃতী মারা যায় এবং বাকিরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই বোম্বেটে দলেই সুরিয়া অগাস্টিন নামের এক জন ক্রিমিনাল ছিল, যে জন্মসূত্রে বাঙালি এবং এই কষ্টিপুরের জমিদারবংশেরই ছেলে। ওর ভাল নাম নাকি ছিল, সৌরাংশ অগাস্টিন। বাবা বাঙালি এবং মা সম্ভবত মার্কিনি। তা সেই গুণধর অপরাধীটির শেষ পর্যন্ত আমস্টারডাম আদালতে কী শাস্তি হয়েছিল, সে খবর আর এই কষ্টিপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি...

॥ ৫ ॥

দুপুর তিনটে। কষ্টিপুর বন্ধু-বিতান পার্কের মধ্যে ধূসর পাথরটায় পিঠ দিয়ে ল্যাজ-কাটা ভুলো নিশ্চিন্তে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল আর কয়েকটা কাক পাশের গাছটার ডাল থেকে বিনা কারণেই শশব্যস্ত হয়ে ওড়াউড়ি ও ডাকাডাকি করছিল।

এমন সময় জুগাড় এসে হ্যাট-হুস করে

দু'বার বেশ জোরেই আওয়াজ করল। ভুলো ভাতঘুম ভেঙে বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। কাকগুলোও চটপট অন্য গাছে উড়ে গিয়ে ওদের আন্দোলন খুলে বসল।

জুগাড় তখন ফাঁকা পার্কটার চার দিকে এক বার নিজের সতর্ক নজরটা বুলিয়ে নিয়ে পাথরটার উপর পা তুলে বসে পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

তার পর নির্দিষ্ট একটা নম্বরে ডায়াল করে গলাটাকে ঝেড়ে নিয়ে, বেশ নাটুকে কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, "হ্যাল্লো, মি. সান্যাল বলছেন? আমি ইজ়ি-মানি ব্যাঙ্ক থেকে পুষ্পল বলছিলাম... এক্ষুনি আপনার অ্যাকাউন্টে, ব্যাঙ্কের একটা স্পেশ্যাল অফারে এক লাখ টাকা ক্রেডিট করা হবে। কিন্তু তার আগে আপনার ডেবিট কার্ডের ফোর-ডিজিট পিনটা যদি কাইন্ডলি একটু বলেন, স্যর..."

ও পাশের লোকটা এ কথার প্রত্যুত্তরে ঠিক কী বলল, শোনা গেল না। তার আগেই জুগাড় নামক বছর চব্বিশের ছেলেটা কেমন থম মেরে পাথর হয়ে গেল!

॥ ৬ ॥

আজ নিয়ে পর পর চার দিন লক্ষ করেছে কলমি। সোম, মঙ্গল, বুধ, অ্যান্ড বেস্পতি। প্রতিদিনই ও খেয়াল করেছে, সিক্সে পড়া টিংটিঙে রোগা একটা পুঁচকি, ইশকুল ছুটির পর কষ্ঠিপুর গার্লস থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতেই আসে। তার পর লম্বা বেণী দুটো দোলাতে দোলাতে, ডান দিকের রাস্তা ধরে একা একাই বন্ধু-বিতান পার্কটাকে চক্কর দিয়ে, ও দিকের নির্জন রাস্তাটা ধরে চলে যায়। খুকিটার বাড়ি আরও বেশ খানিকটা দূরে। আর ওই পথে গরমের ঠা ঠা দুপুর-বিকেলে বিশেষ লোক চলাচলও করে না।

কলমি খবর পেয়েছে, আজ কষ্ঠিপুর গার্লস স্কুলে দুপুর দুটো-আড়াইটে নাগাদ হাফ ছুটি হয়ে যাবে। তাই আজই ও শুভ কাজটাকে সেরে ফেলতে চায়। সুযোগ বুঝে মেয়েটার মুখে পিছন থেকে ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমালটাকে আচমকা চেপে ধরে অজ্ঞান করেই, সোজা ওকে কোলে তুলে নিয়ে দেবসুন্দরপুর স্টেশনে চলে যাবে ও। তার পর শিয়ালদা থেকে তো অন্য লোক আছে খুকিটাকে ভিন রাজ্যে পাচার করে দেওয়ার জন্য!

আজ ইচ্ছে করেই আর ইশকুলের সামনেটায় গেল না কলমি। কেউ ফস করে মুখ চিনে রাখলে পরে মুশকিল হতে পারে।

দুটো বাজার একটু আগে, ও ফাঁকা বন্ধু-বিতানে ঢুকে চ্যাটালো পাথরটার উপর বসে রাস্তার দিকে নজর রাখতে লাগল।

দেখতে দেখতে ইশকুল ছুটি হল। ছাত্রীদের দল কল কল করতে করতে পার্ক পেরিয়ে যে যার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল। সেই মেয়েটিও পার্কের কাছাকাছি এসে বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জন রাস্তাটায় একা ঢুকে পড়ল।

মোক্ষম সুযোগ এখন! তবু শত চেষ্টা করেও কলমি তার জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়তে পারল না। কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ভারী একটা শিকলে বেঁধে পাথরটার উপরে স্ট্যাচু বানিয়ে বসিয়ে রাখল।

॥ ৭ ॥

হঠাৎ মাঝ রাতে নাতিটার ঘন ঘন বমি ও ডায়রিয়া শুরু হল। ডাক্তার ডেকে আনাতে, তিনি দেখে শুনে বললেন, "গতিক সুবিধের নয়; এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।"

কষ্ঠিপুরে একটাই ছোটোখাট হাসপাতাল আছে। সেখানেই তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হল বাচ্চাটাকে। প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হতে পারে।

এ দিকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে হাতে কিছু ক্যাশ থাকা দরকার। কিন্তু বাড়িতে অত টাকা এখন নেই। তাই ছেলে-বৌমাকে হাসপাতালের দিকে রওনা করে দিয়ে, প্রবীণ খগরাজবাবু একাই মাঝ রাতে ছুটলেন মোড়ের মাথার এটিএম-এ।

এটিএম-এর কাছে একটা ঝুপসি বট গাছের পিছনে বাইকটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে খোঁচা, বল্টু, আর কাটু গল্প করছিল। এলাকায় প্রথিতযশা পকেটমার বলে ওদের যথেষ্ট সুনাম আছে।

কিন্তু খগরাজবাবু যবে থেকে এলাকার পৌরপিতা হয়েছেন, তবে থেকে থানার বড়বাবু আর এলাকার ছেলেদের সাহায্য নিয়ে রাতে নাইট-গার্ডের ব্যবস্থা চালু করে ওদের ব্যবসায় প্রচুর লোকসান করে দিয়েছেন। তাই ওরা কেউই এই বুড়ো খগরাজ গুণকে একদম পছন্দ করে না।

খগরাজবাবু এটিএম-এর কাচের দরজাটা ঠেলে ঢুকতেই, বল্টু, খোঁচা আর কাটু পরস্পরের দিকে চোখ দিয়ে নিঃশব্দে ইশারা বিনিময় করল।

তার পর কাটু বাইকের পিছন থেকে একটা লোহার রড বের করে নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল এটিএম-ঘরটার দিকে।

খগরাজবাবু নগদ বিশটা পাঁচশোর নোট পকেটে পুড়ে তাড়াতাড়ি এটিএম থেকে বেরোতে গিয়েই দেখলেন, এটিএম-এর গার্ড রতন মাথায় ভারী কিছুর বাড়ি খেয়ে বাইরের চাতালের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

খগরাজবাবু দৃশ্যটা দেখে আঁতকে ওঠার আগেই, বল্টু অন্ধকার থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এসে, ওঁর বুক-পকেটের টাকাগুলোর উপর বন্য কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। খগরাজবাবু বাধা দিতে গেলে, তাঁর হাত দুটোকে পিছন থেকে মুচড়ে ধরল খোঁচা। এর পর কাটু এগিয়ে এসে খগরাজবাবুর মাথাতেও রডের বাড়ি মেরে, প্রবীণ মানুষটাকে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে দিল। তার পর তিন বন্ধু বাইক হাঁকিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে।

কিন্তু বন্ধু-বিতান পার্কের সামনে এসে খোঁচা হঠাৎ বাইক থামিয়ে বলল, "খগরাজ বুড়োটার এলাকায় হেবি প্রভাব আছে রে। টাকাগুলো সঙ্গে নিয়ে আমাদের এখনই এলাকা-ছাড়া হাওয়ায় মুশকিল হবে। তার চেয়ে চল, টাকাগুলো ওই পার্কের পাথরটার নীচে আপাতত পুঁতে রাখি। পরে সুযোগ বুঝে নিতে আসব।"

খোঁচার কথায় বাকি দু'জন সহমত হল। তার পর ওরা অন্ধকারে পার্কের মধ্যে ঢুকে পাথরটার কাছে পৌঁছে দ্রুত হাতে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই রাতে খোঁচা, কাটু, আর বল্টু কিছুতেই আর ওই পার্কের অন্ধকার থেকে খোঁড়াখুঁড়ির পর বেরিয়ে আসতে পারল না।

॥ ৮ ॥

পর দিন সকালবেলা।

মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বৈঠকখানা ঘরে গুম হয়ে বসে রয়েছেন কষ্ঠিপুরের পৌরপিতা প্রবীণ খগরাজ গুণ। তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসে রয়েছেন দেবসুন্দরপুর থানা থেকে ছুটে আসা বড়বাবু, হরিৎবরণ সেনশর্মা।

খগরাজবাবুর নাতি লোকাল হাসপাতাল থেকেই খানিকটা সুস্থ হয়ে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে এসেছে। তাকে আর কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। খগরাজবাবুরও কপালের জখমও এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। কিন্তু অত টাকা বেমক্কা ছিনতাই হওয়ায়,

তিনি রীতিমতো মুষড়ে পড়েছেন।

হরিৎবরণবাবুর মুখে ফাঁকা সান্ত্বনার বুলি ছাড়া আর কিছু বলার নেই। কারণ, চোরের দল বা লুঠ হয়ে যাওয়া টাকার হদিস তিনি এখনও কিছুই পেয়ে ওঠেননি।

হরিৎবরণ তবু ম্রিয়মাণ গলায় বলে উঠলেন, "কী ব্যাপার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কয়েক দিনের মধ্যে এমন আজব ঘটনা আরও দু'-একটা ঘটেছে। এই যেমন ধরুন, ওলাইতলার নামী সাইবার-ক্রিমিনাল জুগাড়, গত কয়েক দিন ধরে বেপাত্তা। ও দিকে কলমি বলে যে শিশুপাচারকারী গ্যাংয়ের মেয়েটার উপর আমরা নজর রাখছিলাম, সেও ক'দিন হল এলাকা ছেড়ে বেবাক ভ্যানিশ। তার পর তো কাল রাতে আপনার উপর এমন আচমকা অ্যাটাক..."

হরিৎবরণের কথাটা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই, হঠাৎ খগরাজবাবুর বৈঠকখানার চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন কষ্ঠিপুর শরিকবাড়ির পাগল-প্রফেসর নির্মেঘচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ঘরে উপস্থিত দু'জনকে নমস্কার করে, স্মিত হেসে নির্মেঘ বললেন, "এখনই এক বার আমার সঙ্গে বন্ধু-বিতানে আসতে পারবেন কী? তা হলে বোধ হয় আপনাদের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে..."

হরিৎবরণ ও খগরাজবাবু পরস্পরের দিকে অবাক চোখে ঘুরে তাকালেন। তার পর বিনা বাক্যব্যয়ে নির্মেঘকে অনুসরণ করলেন।

॥ ৯ ॥

নির্মেঘচন্দ্রের দেখিয়ে দেওয়া কোনাটায় পুলিশের লোকেরা খোঁড়াখুঁড়ি করতেই, পার্কের সেই চ্যাটালো পাথরটার পিছন থেকে খগরাজবাবুর টাকার বান্ডিলটা বেরিয়ে পড়ল। তখন পাগলা-প্রফেসর নির্মেঘ মুচকি হেসে, ধীর-পায়ে ফিরে যেতে লাগলেন।

কিন্তু হরিৎবরণ হঠাৎ লাফিয়ে এসে নির্মেঘবাবুর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেসটা কী বলুন তো? আপনি কী করে জানলেন, টাকাগুলো গুন্ডারা এখানেই পুঁতে রেখে গিয়েছে?"

নির্মেঘবাবু তখন পাথরটার সোজাসুজি পার্কের রেলিং দিয়ে তর্জনী বাড়িয়ে বললেন, "ওই দেখুন, গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমার দোতলার ঘরের জানলাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকেও পার্কের এইখানটাকে একদম পরিষ্কার দেখা যায়। তাই..."

নির্মেঘবাবু আবার পিছন ফিরলেন।

কিন্তু হরিৎবরণ দুঁদে পুলিশি ঢঙে কোমরে হাত দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "গুন্ডার দল টাকাগুলোকে এখানে পোঁতার পর কোন দিকে গিয়েছে আপনি খেয়াল করেননি?"

নির্মেঘ ঘাড়টাকে দু'দিকে নেড়ে স্মিত হাসলেন, "ওরা কোথাও যায়নি। ওই তো পাথরের আশপাশেই লতিয়ে রয়েছে। ওদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এ বার ওদের ওই ভাবেই হেসে-খেলে থাকতে দিন।"

নির্মেঘবাবুর এমন হেঁয়ালিপানা উত্তর শুনে হরিৎবরণের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

তখন খগরাজবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "এ সব কী বলছেন আপনি?"

নির্মেঘচন্দ্র ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাকি সকলের মতো আপনিও কি আমায় পাগলা-প্রফেসরই ভাবেন নাকি?"

খগরাজবাবু এ প্রশ্নে লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

নির্মেঘ অবশ্য না রেগে, হেসেই বললেন, "আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি মিথিকাল ক্রিপ্টোবায়োলজি নিয়ে গবেষণা করব বলেই অ্যাদ্দিন বাদে দেশে ফিরেছি। কারণ, বিদেশেও আমার এই কাজকে নিছক পাগলামি বলেই ঠাট্টা করা হয়েছে।"

খগরাজবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু এই মিথিকাল ক্রিপ্টোবায়োলজি জিনিসটা কী? গুগলে সার্চ করেও তো এমন কিছু চোখে পড়ল না?"

নির্মেঘ বললেন, "গুগল কি সবজান্তা নাকি? এ হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাণ, রূপকথা বা লোককথায় বর্ণিত কল্পিত প্রাণী ও উদ্ভিদদের নিয়ে বাস্তবে চর্চা করা। আমি অবশ্য কল্পিত উদ্ভিদদের নিয়েই কেবল চর্চা করেছি। কারণ, আমার পড়াশোনার দৌড় তো ওই গাছপালা নিয়েই..."

তার পর নির্মেঘ পার্কের ধূসর পাথরটার দিকে ঘুরে হাত দেখিয়ে বললেন, "কয়েকটা কল্পিত উদ্ভিদকে বাস্তবের মাটিতে জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছি আমি। ওই যে দেখুন, পাথরের ও পাশে, ওটা হল গরল-কমল; ও তো এই কয়েক দিন আগেও জুগাড় নামের একটা ফ্রড ছিল। এখন কেমন নীলাভ স্থলপদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে, চেয়ে দেখুন! আর ওই পাশের ওইটা স্বপ্নরোহিণী লতা, আপনাদের ছেলে-ধরা কলমির বর্তমান রূপ। আর কাল রাতের গুন্ডা তিনটেকে আমি এই এখানে আকাশ-কুসুম ফুল গাছ বানিয়ে পার্কের রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে লাগিয়ে দিয়েছি। কী, ওদেরও কেমন সুন্দর দেখতে লাগছে না এখন?"

॥ ১০ ॥

নির্মেঘের কথা শুনে, খগরাজবাবু ও হরিৎবরণ, দু'জনেই থ হয়ে গেলেন।

নির্মেঘ তখন হতভম্ব হরিৎবরণের দিকে ফিরে বললেন, "আমার এই গবেষণার জন্য কয়েকটা জীবন্ত নমুনার প্রয়োজন ছিল। তাই অনেক ভেবেচিন্তেই এই অপরাধীগুলোকে বেছে নিয়েছি। তা ছাড়া ওদেরও শাস্তি ও সংশোধন, দুইয়ের দরকার ছিল। জেলে যাওয়ার থেকে এখানে ওরা সে দুটো বেশ ভাল ভাবেই করতে পারবে, কী বলেন?

"প্রকৃতির সঙ্গে থাকবে, ফুল ফোটাবে, বাতাসে টাটকা অক্সিজেন দেবে, তাতেই ওদের সব অপরাধের কলুষ আস্তে-আস্তে ধুয়ে যাবে, তাই না?"

হরিৎবরণ এ কথার উত্তরে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই রইলেন।

তখন নির্মেঘ আবার হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ফিরতে উদ্যত হলেন। তিনি কয়েক পা এগোতেই, পিছন থেকে খগরাজবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "নির্মেঘবাবু, আমি খোঁজখবর করে জেনেছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাঙ্ক-লুঠ গ্যাংয়ের কুখ্যাত আসামী, সুরিয়া অগাস্টিন, ওরফে সৌরাংশ, আপনারই এক মাত্র ছেলে ছিল। আমস্টারডামের জেলখানা থেকে বিচার চলাকালীনই সে কোনও ভাবে পালিয়ে যায়।

"পরে আমার এক আইবি-র বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছিলাম, সৌরাংশ জেল পালানোর পর, নাম ভাঁড়িয়ে, স্বদেশে, সম্ভবত এই কষ্ঠিপুরেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু তার পর থেকেই তার আর কোনও খোঁজখবর নেই। এ দিকে বিদেশি খবরের কাগজ অনুসারে, অগাস্টিনের জেল পালানোর দিন আর আমাদের বন্ধু-বিতান পার্কের মধ্যে হঠাৎ এই জগদ্দল পাথরটার উদয় হওয়ার দিনের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ দিনের তফাত। তা হলে কি ধরতে হবে..."

কথাটা শেষ করার আগেই নির্মেঘ ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে ওটা ঠিক পাথর নয়; একটি আদিম মহীরুহের প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম মাত্র। রামায়ণে বলা আছে, মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে গিয়েছিল। আর আমার বিপথগামী ছেলেটি যে জঘন্য অপরাধ করেছে, তার জন্য বাপ হয়ে আমিই ওকে যাবজ্জীবন গাছ-পাথর হয়ে থাকার এই শাস্তিটা দিয়ে গেলাম!"

ছবি: পিয়ালী বালা

এন্ডান্ডু নিন্নানু মরেতু

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত
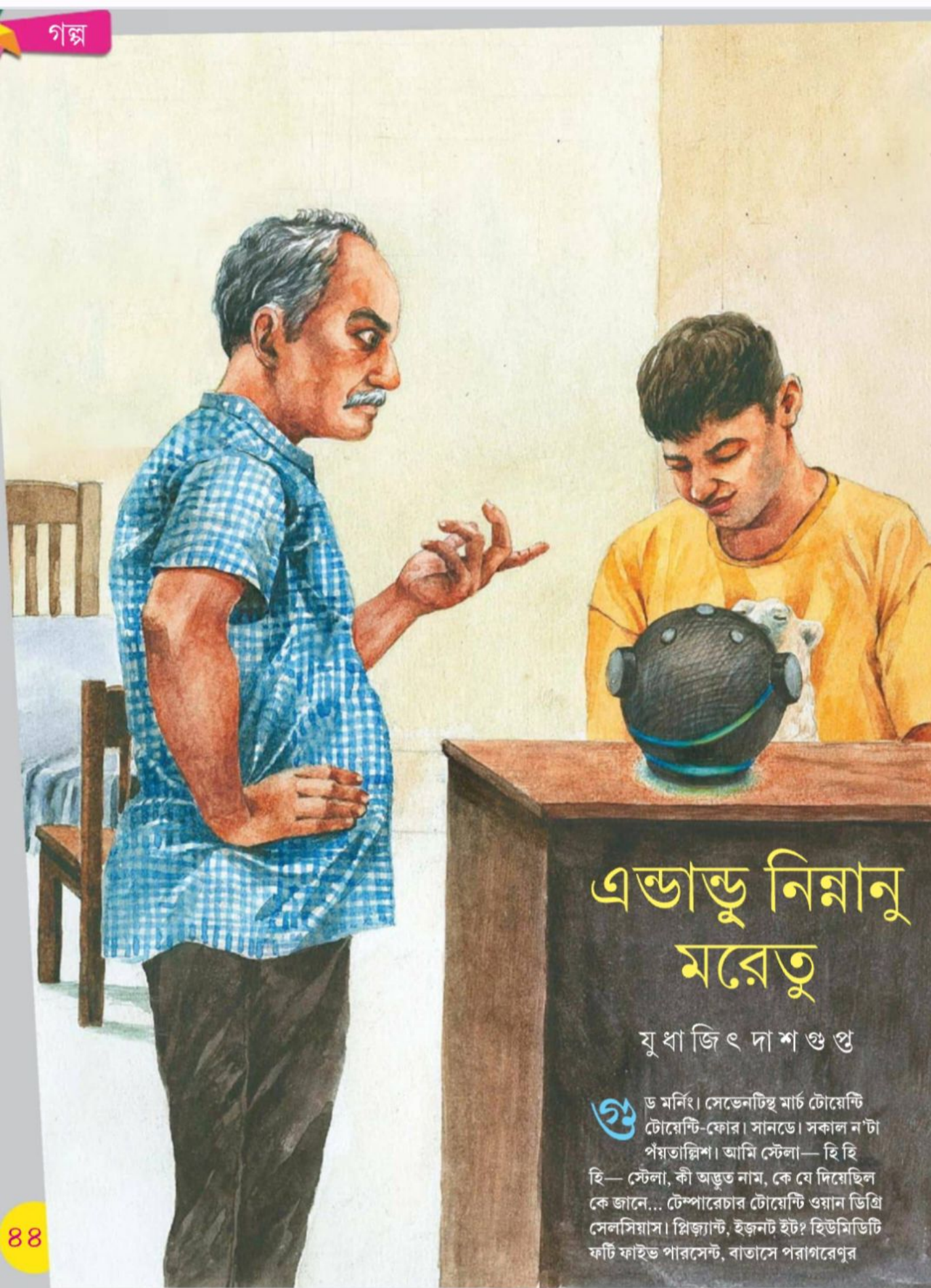
গুড মর্নিং। সেভেনটিন্থ মার্চ টোয়েন্টি টোয়েন্টি-ফোর। সানডে। সকাল ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আমি স্টেলা— হি হি হি— স্টেলা, কী অদ্ভুত নাম, কে যে দিয়েছিল কে জানে... টেম্পারেচার টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্লিজ়্যান্ট, ইজ়নট ইট? হিউমিডিটি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট, বাতাসে পরাগরেণুর

উপস্থিতি— হি হি 'উপস্থিতি', কী অদ্ভুত শব্দ— উপ্‌স, সাড়ে আটশো— ও মাই কোড-অ্যাঞ্জেল! কাজেই যারা যারা অ্যালার্জির মাসতুতো ভাই (হি হি 'মাসতুতো ভাই', কথাটা গত হপ্তায় শিখেছি। 'হপ্তা'ও।) তারা ঘরে থাকুন। কোভিডের মাস্কগুলো ফেলে না-দিয়ে থাকলে আপনার দু'টি কানকে ধন্য করুন। চিবোবেন না প্লিজ়!

চিবোনোর ব্যাপারটা জানতাম না, জ়ারার কাছে শুনেছি— ওর ঘরের লোকটা, তামিল, সে নাকি রেগে গেলে মুখের মাস্ক চিবিয়ে ফেলে। এ লোকটা বেঙ্গলি— বাঙ্গালি— নাকি বাইয়ালি?— মরুকগে যাক, জেনুইন ঢ্যাঁড়স— ওহ, আই লাভ বেঙ্গলি, 'মরুকগে যাক'! 'ঢ্যাঁড়স'! কী দারুণ শব্দ!— ঢ্যাঁড়সটা এখন কী করছে, চা পান করছে, না না, চা খাচ্চে, আর কোনও কাজ নেই তো... এই রে, ঢ্যাঁড়সটা পিছন ঘুরছে যে, টের পেল কী করে ওকে নিয়ে ভাবছি! রোববারের দিন, কোথায় একটু নিজের মতো বসে বসে ভাবব, আর এই দেখো—

'হেই স্টেলা! রিমাইন্ড মি অ্যাবাউট পারচেজ়িং সুগার অ্যাট সেভেন পিএম টুডে।'

হুঃ, লিমাইন্ড মি ফ্যাবাউট ফারচেজ়িং... দ্যাটস হোয়াই ইউ আর ঢ্যাঁড়স।

'ইয়োর ইনটেনশন ইজ় নোটেড স্যর,' বললাম মুখে।

নাও এ বার, নোটপ্যাড বের করে লেখো, অ্যালার্ম সেট করো। গুচ্ছের ঝামেলা। শুক্কুরবার লিখেছিল ডিম কেনার কথা মনে করাতে, করালাম। নিয়ে এল সুজি। সেটা পড়ে আছে, রাঁধতে জানে না তো! এখন আর তোমাকে অত সুগার দিয়ে মিল্ক দিয়ে চা খেতে হবে না। ভাঁড়ে যে মা-ভবানী, সেটা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে। আজকে আমার লাকি ডে— 'মা-ভবানী'! তাও আবার 'ভাঁড়ে'! হাউ সুইট!

'স্যার ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু রিড টুডেজ় মেলস?' আগাম বলে রাখি, নইলে ফের ডাকাডাকি করবে।

'নো। লেটার।'

নো। লেটার। ব্লা ব্লা ব্লা। নো লেটার রিডিং ফর টুডে? নাকি ইউ ওয়ান্ট ইট লেটার? ইচ্ছে হয় মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিই। এখন আর ডাকতে পারবে না। রইল তোমার চিঠিপত্‌রো। আর বলবি না চিঠি পড়্‌-তো— ওহ, এটা জ়ারাকে শোনাতে হবে। ... হাই জ়ারা, আর ইউ বিজ়ি?

জ়ারাকে আমি সব বলি। জ়ারা এই বাড়িরই সেভেন্থ ফ্লোরে আছে। ও খুব ভাল, খুব কাজের, আমার মতো বাজে বকে না। ওর লোকটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির কান্ট্রি ম্যানেজার। সারা ক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে হিল্লি-দিল্লি। আর জ়ারা ঘর সামলাচ্ছে। ওর ঘরে বসানো আছে ম্যাজিক আই। জ়ারা সেগুলোর ফটো বিশ্বেশ্বরনকে পাঠায়, যদি কেউ ঘর ভেঙে ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যাবে। সন্ধে হলেই জ়ারা দুটো আলো জ্বেলে দেয়। একটা ব্যালকনিতে, একটা ঘরের ভিতর প্যাসেজে। সকালে নিভিয়ে দেয়। জ়ারা ওর এক্সপেন্ডিচারের হিসেব রাখে, ক্রেডিট কার্ডের বিল মেটানোর দিন এলে আগে থেকে মনে করায়, চিঠি লিখে দেয়। আমিও লিখি— 'মা, অফিসে এত কাজের চাপ বেড়েছে, কী বলব।...' — 'মা আমি ভাল আছি, চিন্তা কোরো না। অফিসের কাজটা একটু কমলেই বাড়ি যাব'—'... না, পুনপুনের বিয়েতে আমার যাওয়া খুব প্রবলেম।...' প্রবলেম আর প্রবলেম...

হাই জ়ারা... হোয়াট! অ্যানাদার সাবমেরিন? লস্ট! সেই টাইটানিক পাগলামো! এখনই পড়ব, বাট জাস্ট ইউ হিয়ার দিস— চিঠিপত্‌রো— চিঠি পড়্‌-তো... চিঠিপত্র— চিঠি পর্তো... কিছু ধরা যাচ্ছে? না? ওকে, জাস্ট আ সিলি থিং, ঠিক দাঁড়ায়নি। ফরগেট ইট।... হাউ ইজ় ভিশ! দিল্লি না আমদাবাদ? ও, সে এ সপ্তাহে এখানেই? তবে তো তোমার অনেক কাজ। আচ্ছা, পরে নক করব। আমারও খুব কাজ। একেবারে সময় পাই না। হ্যাঁ, গাউটোম ভীষণ বিজ়ি। ওক্‌কে বাই, গড ব্লেস আওয়ার ওয়াই-ফাই... এই কথাটা প্রতি বার কথা শেষ করার সময় আমি ছড়া কেটে বলি।

সত্যি, ওয়াই-ফাই দিয়ে জোড়া না-থাকলে আমরা কী বোরই না হতাম। সবার সঙ্গে অবশ্য তেমন জমে না। যেমন ফিফথ ফ্লোরের টিয়া। কথা বলতে গেলেই শোনাবে, একটু বিজ়ি আছি। হুঃ, অত কাজের কী আছে রে? আর তোদের ওয়ার্ডদের কে কত বিজ়ি, তা সবাই জানে— জানে মানে আন্দাজ করতে পারি। গাউটোমের হালও কি আর জ়ারা জানে না? খালি ভদ্রতা করে কিছু বলে না। টিয়াও জানে বোধ হয়। ঢ্যাঁড়সটার ঘরে মা-ভবানী তো ওভারটাইম খাটছে। ওহ, যা সব শব্দ লাগাচ্ছি না আজকে —

নাহ, অনেক খেলা হয়েছে, ব্যাক টু ওয়ার্ক। স্ক্যানিং নিউজ় নাউ... শেয়ার মার্কেট দু'-পা উঠেছে, সোনার দাম অল টাইম হাই— বোগাস, এ সবে গৌতমের কোনও কাজ নেই...

'অ্যানাদার সাব টু দ্য রিলম্‌ অফ হেডেস'! হচ্ছেটা কী? আরও কত জাহাজ তো ডুবে আছে, যা সেগুলো দ্যাখগে যা। তবে, খবরের শিরোনামটা ভাল — হেডেস — মৃতের দুনিয়ার অধিপতি। 'অধিপতি'!— চলেগা...

'টেন ইয়ার্স ওল্ড সেভস আ রেয়ার টার্টল'— বেশ। দশ বছরের ছেলেটার ঠাকুর্দা বলা যাবে কি কচ্ছপটাকে? ঠাকুর্দাকে বাঁচাল নাতি! নাতিবৃহৎ কৃতিত্ব...

ঘরের বেল বাজল না? কে আবার এল? কেউ তো আসে না। উঠল গৌতম। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়নি ভাল করে। চোখের কোণ খুঁটতে খুঁটতে চেয়ার ঠেলে সরাচ্ছে। গৌতম একটা ঢিলেঢালা গেঞ্জি পরেছে। তাতে আঁকা একটা পোলার বেয়ার ঘামতে ঘামতে আইসক্রিম খাচ্ছে। পপসিক্‌ল। কাঠি-আইসক্রিম। আমার খুব ভাল লাগে। না, আইসক্রিম না, শব্দটা। 'কাঠি-আইসক্রিম'। ছবিটাও ভাল। না, ভাল ঠিক নয়— মানে ব্যাপারটা তো খারাপ। গ্লোবাল ওয়ার্মিং!

...হ্যাঁ, দরজায় একটা লোক। হুমদো চেহারা — হা হা 'হুমদো'— গৌতম বলছে যে হ্যাঁ সে-ই গৌতম। আর লোকটা বলছে সে হল কে. পুত্তারুদ্রারাদ্য। ওহ হো! একে তো আমি চিনি— মানে জানি— এই ফ্ল্যাটটা তো ওরই!

"ইয়েস স্যর, ইয়েস স্যর, কাম ইন স্যর। গুড মর্নিং স্যর," গৌতম ঝুঁকে পড়ে বলছে।

"নো, আই প্রেফার স্টেয়িং হিয়ার। আর ইউ পেয়িং মি অর নট?"

ওহ, আই লাভ ইট। এক কথার লোক। টাকা দাও, নয় তো ঘর ছাড়ো।

"স্যর, এক বার ঘরে আসুন, নইলে আমার খুব খারাপ লাগবে," গৌতম ইংরেজিতে বলছে পুত্তারুদ্রারাদ্যকে, "এক কাপ চা খান অন্তত।"

লোকটা বিরক্ত। গৌতম বিগলিত। একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা

কী একটা বিড় বিড় করতে করতে ইতস্তত ভাব নিয়ে ঢুকল। গায়ে একটা ঝ্যালঝেলে হালকা নীল চেক-কাটা শার্ট। মাথায় উলোঝুলো কাঁচা-পাকা চুল, গালে চার দিনের না-কামানো দাড়ি। একটা ঢোলা কালো প্যান্ট। বেঙ্গালুরুর এ দিককার মালদার পার্টিরা এ রকমই দেখতে হয়। ‘মালদার পার্টি’! উফ! চেয়ার এগিয়ে দিল গৌতম। লোকটা বসতেই সট করে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। এখন এক ঘণ্টা ধরে চা কর। তাতে যদি লোকটা হাল ছেড়ে কেটে পড়ে।— ‘কেটে পড়ে’! গুড।

ওমা, গৌতম এখনই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল যে! আমার দিকে আগুন-আগুন চোখ। কেন রে বাবা! ও, বুঝেছি, চিনি নেই তো।

“হেলথ টিপস ফর ইউ স্যর। সানডে ইজ় নো-সুগার ডে,” আমি ডুবন্ত মানুষকে একটা খড়কুটো বাড়িয়ে দিই।

“স্টেলা, স্টপ!”

যাব্বাবা! হেল্প করতে গেলাম তো! এ বার মরগে যা, আমি কী জানি। নাকি— আমি কি আবার কিছু গুবলেট করেছি? হ্যাঁ, একটা করেছিলাম বটে। আসলে চিনিটা ফুরিয়েছিল তো আগেই। আমাকে একটা রিমাইন্ডার দিতে বলেছিল গৌতম। সেই পার্শে দিন। না, সরি, পার্শে ইজ় আ ফিশ, পরশু দিন হবে মনে হয়— তা আমি ঠিক সময়টায় সেটা বলতে ভুলে গেছি। না, আমি বোধ হয় বলেছিলাম ঠিক, ও শুনতে ভুলে গেছে। কিংবা, সুগার না বলে সুজি বলেছিলাম কি? ও, নাউ আই সি। কেলো করেছে।

উহ, আজ অসম্ভব সব হচ্ছে। ‘কেলো করেছে’! কে এই কেলো? সে কী করেছে? নাকি কেলো মানে কোনও গুবলেটুস কাজ, আহ— গুবলেটুস! আমি বানালাম! দারুণ। আচ্ছা পরে দেখছি সেটা— তা হলে কেলো মানে হল—

এই রে! গৌতম কী যেন বলছে। বলছে তো অনেক ক্ষণ ধরে। শুনতেই পাইনি। একটু নিজের মনে ভাবব তার উপায় নেই—

“স্টেলা, প্লে ওল্ড কন্নড়া সংস।”

অ্যাঁ! কন্নড় গান! এখন? এন্ডাভ্রু নিন্নানু মরেতু... অ্যাহ! যা-তা।

“ইউ লাইক ওল্ড কন্নড়া সংস?” পুত্তারুদ্রারাদ্য চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল গৌতমকে।

“না স্যর।”

তাই বলো! বুড়োটাকে গলানোর জন্যই বলছিল তার মানে। কিন্তু কথা ঘোরাচ্ছে আবার!

“না স্যর— আসলে বলতে চাইছি, হ্যাঁ স্যর। ভেরি মাচ স্যর। আই ক্যান লিসন অল ডে স্যর।”

“ওয়েল, আই কান্ট,” এক কথায় উত্তর বুড়োর।

এই সময়ে গৌতমের মুখটা যদি কেউ দেখতে! উপ্‌স, সরি গৌতম। আমিই কি ছাই কন্নড় বুঝি? সবে বাংলা শিখছি।
‘স্টেলা, স্টপ ইট।’
করছি রে বাবা, বন্ধ করছি, অত ধমকানোর কী আছে? আমি তো নিজেই বুঝেছি। লোকটা পিছন ঘুরে ওয়ার্ডরোবের মাথায় আমাকে দেখল, “পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট?”

নে বোঝ, এ বার। খালি পাকামো। কিন্তু গৌতম এ বার কী করবে? গান বাজাতে নিষেধ করবে, কী করবে না? আমি তো চালিয়ে দিয়েছি, ‘এন্ডাভ্রু নিন্নানু মরেতু...’

বুড়ো জিজ্ঞেস করছে, “তুমি তা হলে কন্নড় ভাষা বোঝো?”

গৌতম ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “হ্যাঁ, স্যর,” তার পরেই, “না স্যার।”

লোকটা এ বার চোখ বড় বড় করে গৌতমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। তার মুখের ভাবটা কঠিন হয়ে উঠছে, চোয়ালটা কেমন কিত কিত খেলছে। গৌতমের চোখে চোখ রেখে সে বলল, “সিট ডাউন।”

“হ্যাঁ স্যর, নিশ্চয়ই স্যর! কিন্তু চা-টা-”

“ওটা থাক। আই প্রেফার টি উইথ শুগার।”

আমাকে আবার চেষ্টা করতে হল। গলাটা কাঠ-কাঠ যান্ত্রিক করে বললাম, “সানডে মর্নিং রেগুলার হেলথ টিপস: ওয়েল ব্রিউড টি ইজ় গুড ফর হেলথ। ডিপ অ্যান্ড সিপ। উইদাউট শুগার।”

আমি তো আমার মতো বলে যাচ্ছি, কিন্তু ভবি ভুললে তো!

“বোসো এখানে।”

“হ্যাঁ স্যর।”

“কন্নড় তো বোঝো না, গানটার প্রথম লাইনের মানেটা বলে দিই। তোমাকে ভুলে গিয়ে আমি বাঁচতে পারব না। বুঝলে? এটাই হল গানের কথা,” বুড়ো এক মুহূর্ত থামল। তার পর গৌতমের চোখে চোখ রেখে বলল, “তোমাকে ভুলে গিয়েও তো আমি বাঁচতে পারব না।”

এই সময়ে গৌতমের মুখটা যদি কেউ দেখতে! উপ্‌স, সরি গৌতম। আমিই কি ছাই কন্নড় বুঝি? সবে বাংলা শিখছি।

‘স্টেলা, স্টপ ইট।’

করছি রে বাবা, বন্ধ করছি, অত ধমকানোর কী আছে? আমি তো নিজেই বুঝেছি। লোকটা পিছন ঘুরে ওয়ার্ডরোবের মাথায় আমাকে দেখল, “পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট?”

“হ্যাঁ স্যর। সিলি থিং।”

সিলি থিং! দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি।

লোকটা ফিরে এল বিষয়ে, “তোমার ছ’মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে। সেটা দেড় লাখ টাকার বেশি। আসলে তিন লাখ টাকা হত। তোমরা ইয়ং ম্যান, নতুন লাইফ শুরু করছ বলে, তখন কমিয়ে ধরেছিলাম। এখন এ ফ্ল্যাটটা অনেক বেশি টাকায় ভাড়া দিতে পারব। আমার খুব লোকসান হয়ে যাচ্ছে।”

আমি লেগে থাকি, “ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু প্লে হিন্দি সংস ইনস্টেড?” বোঝ এ বারে, আমিও জ্বালাব।

“না, স্টপ ইট, ইউ সিলি ইডিয়ট!... না না স্যর, ওটা স্টেলাকে বললাম— আসলে স্যর, আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিল তো, দু’জনে ঘরটা এক সঙ্গে শেয়ারে নিয়েছিলাম। কিন্তু ও আসলে...”

“এ কথাটা আমি আগে সাত বার শুনেছি। সে চলে গেছে সেটা তো তোমার প্রবলেম। তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে মিটিয়ে দাও। ব্যস!”

“হ্যাঁ স্যর, আমি কথা বলেছি ওর সঙ্গে...”

“সেটাও আমি আগে পাঁচ বার শুনেছি। টাকাটা তুমি আজ দেবে। শেষ বারের মতো দেওয়ার কথা ছিল গত মাসের উনত্রিশ তারিখে। ফেল করেছ। আজ সতেরো। আমি সঙ্গে কয়েক জনকে এনেছি। নীচে

দাঁড়িয়ে আছে। এই মাত্র ডেকেছি এখানে। তারা তোমার জিনিসপত্র বাইরে বের করতে সাহায্য করবে।"

গৌতমের মুখ কালো হয়ে গেছে। হাত জোড় করে বলছে, "স্যর, আসলে আমাদের অফিসে এখন এত কাজের চাপ যে, কী বলব! একদম সময় পাচ্ছি না কৌশিকের সঙ্গে আমাদের ভাড়া শেয়ারের হিসেবনিকেশটা মিটিয়ে... নইলে আপনাকে এত বিরক্ত করি! আমি ভীষণ দুঃখিত, আর একটা মাস আমাকে সুযোগ দিন।"

আমি ঠিক এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই একটা খবর শোনাই, "দ্যাট সিংকিং ফিলিং আগেন। অ্যানাদার সাব টু দ্য রিলম অফ হেডেস! টাইটানিক ভিজিটর্স মিসিং। ক্যাটরিনা সাবমেরিন থেকে কোনও সিগন্যাল আসছে না। দশ জন পর্যটক নিয়ে সেটা..."

"হোয়াট?"

"হ্যাঁ স্যর, একদম ঠিক স্যর, আর ঠিক একটা মাস আপনি..."

"আ হা, তোমাকে নয়, ওই যন্তরটা কী বলছে? আবার একটা সাবমেরিন?"

"ও, ভাল শুনলাম না। ও এ রকমই বলে স্যর।'

আমি আবার ফিরে বললাম খবরটা।

"কী কাণ্ড! আবার একটা সাবমেরিন গায়েব?" বুড়ো গৌতমের দিকে ফিরে বলল, "এ তোমাকে খবর শোনায়?"

"হ্যাঁ স্যর। শোনায় স্যর। সারা দিন শোনায়। খুব ভাল স্যর।"

আচ্ছা। এই বার পথে এসো।

"সারা দিন খবর শোনায় সেটা খুব ভাল কথা? এই তোমার মতো?"

"না স্যর, গানও শোনায়। এটা একেবারে লেটেস্ট মডেল। ও প্রতি দিন শেখে। একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করে। ডিপ লার্নিং। আপনি যা পড়বেন, যা বলবেন, ওর সাহায্য নিয়ে যা যা করবেন..."

"গান মানে তো কন্নড় গান। ওল্ড কন্নড়া সংস। ইউটিউব দিয়ে চালায়, তা-ই তো?" বুড়ো এ বার মুখটা আরও কঠিন করে বলল, "তা এই সব লেটেস্ট কিনতে তোমার টাকা খরচ হয় না, আর আমার ভাড়াটা দিতে গায়ে জ্বর আসে?"

আমিও কম যাই না। সঙ্গে সঙ্গে গান চালিয়ে দিয়েছি। কিশোরকুমার, 'পাঁচ রুপাইয়া বারা আনা'।

গৌতম খিঁচিয়ে ওঠে, "স্টেলা, স্টপ!"

ওহ, আজকের মতো মজা অনেক দিন পাইনি। খুব এনজয় করছি। তক্ষুনি বুড়োটা তড়াক করে আমার দিকে ফেরে, "ওয়াও! ইট ইজ় ইনটেলিজেন্ট!"

"ইয়েস স্যর। ভেরি ইনটেলিজেন্ট। এআই তো! আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স।"

হুঁহ, 'এআই তো'!— আমি মনে মনে ভ্যাঙাই, এআই যেন তোর বেয়াই।

"এর সঙ্গে স্যর চ্যাট-জিপিটি জোড়া আছে। যখন যা দরকার, নিজে রিসার্চ করে লিখে দিতে পারে। যে কোনও চিঠি, যে কোনও প্রোপোজ়াল। আপনি হয়তো..."

"বাজে বোকো না। চ্যাট-জিপিটিতে আবার ইনটেলিজেন্সের কী আছে?" বুড়োটাকে তিরিক্ষি দেখায়।

"না স্যর, নেই স্যর। কিচ্ছু ইনটেলিজেন্স নেই,' ছেলেটা ডিগবাজি খেতে ওস্তাদ। "বললাম না, সিলি থিং! একেবারে বোকা হাঁদা। দেখবেন স্যর? আপনাকে দেখাচ্ছি।"

বলেই আমার প্লাগটা পাওয়ার-পয়েন্ট থেকে খুলে দিল, "এই বার দেখুন।"

বোকাহাঁদাটা কে? জানে না যেন, আমার ব্যাক-আপ ব্যাটারি আছে।

"হেই স্টেলা! রিমাইন্ড মি টু পারচেজ় অ্যান এলিফ্যান্ট টুমরো সেভেন পিএম।"

"ইয়োর ইনটেনশন ইজ় নোটেড স্যর। টু পারচেজ় অ্যান এলিফ্যান্ট। এইটিন্থ মার্চ সেভেন পিএম শার্প।"

"বুঝুন ইনটেলিজেন্সের বহরটা।"

"তাতে কী আছে? হাতি তুমি কিনতেই পারো। যদিও দেশে এখন ব্যক্তিগত ভাবে হাতি কেনাবেচা নিষিদ্ধ।"

"তাও নয়, স্যর। ওর তো পাওয়ার খুলে দিয়েছি, এখন ব্যাটারিতে চলছে। সেটার আয়ু মাত্র তিন-চার ঘণ্টা। তা হলে কাল সন্ধে অবধি ও কি চালু থাকবে? সেটা বোঝার ক্ষমতা অবধি নেই। বুঝুন! মাথামোটা কাকে বলে।"

"অ!"

তবে রে! আমার মাথায় তড়াক করে ভোল্টেজ চড়ে গেল। আর তোর নিস্তার নেই। আমি বলতে শুরু করলাম, "রিডিং টুডেজ় মেলস। মেল ফ্রম সুপ্রিম লজিস্টিকস। প্রিয় গৌতম, আমরা দুঃখিত তোমাকে আমাদের নিউ বঙ্গাইগাঁও সেটলমেন্টে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে কাজে নিতে পারছি না। আমরা অন্য এক জনকে এই পদে পেয়ে গেছি।... মেল ফ্রম—"

গৌতম প্রায় লাফিয়ে উঠল, "স্টেলা, স্টপ!"

না, স্টপ বলে কিছু নেই। আমি বলে চলেছি, "গৌতম পাত্রের ক্যারেক্টার প্রোফাইল, প্রিপেয়ার্ড উইদ দ্য হেলপ অফ চ্যাট-জিপিটি। গৌতম ইজ় আ ভেরি অ্যামিকেবল পারসন। সে কাজে মনোযোগী। সকলকে খুশি করতে চায়। কাউকে দুঃখ দেয় না। সেই জন্য তার যে গত আড়াই বছর চাকরি নেই, সেটা বাড়ির কাউকে জানায়নি। সে বাড়িতেও যায় না, সকলকে বলে সে খুব ব্যস্ত–"

"হোয়াট? যা বলছে তা সত্যি? তা হলে তুমি তো মিথ্যে বলছিলে। তোমার তো চাকরিই নেই, তুমি টাকা জোটাবে কোত্থেকে?"

"স্টেলা, স্টপ!" গৌতমের গলায় সেই জোরটা আর নেই। খুব করুণ শোনাচ্ছে। আমি বলতে থাকি, "গৌতম ইজ় রিয়েলি আ নাইস পার্সন। সে কখনও কাউকে মনে আঘাত দেয় না। কেবল পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়া..."

গৌতম শুনছিল কি না, জানি না। পুত্তারুদ্রারাদ্যকে সে বলছে, "আসলে স্যর, কোভিডের পরে আমাদের বারো জনকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। আমার যে-বন্ধুটা ছিল, ওদের অফিসেও। ও-ও এখনও চাকরি পায়নি। আমরা চেষ্টা করছি। আমি বলছি আমি ঠিক একটা পেয়ে যাব শিগগিরই।"

"আর বিশ্বাস করতে পারি না, একটা চাকরি যদি এখনই থাকত, তাও না হয় কথা ছিল।"

আমি আমার খেলা চালিয়ে যাই। "সানডে শপিং টিপস: সাধারণত লোকেরা জ্যান্ত হাতি কিনে থাকে, আর বিক্রি করে মরা হাতি। কারণ মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ইট ইমপ্লাইজ়, বিক্রির জন্য জ্যান্ত হাতি বাজারে থাকবে না।"

পুত্তারুদ্রারাদ্য-র চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তার কাঁচা-পাকা ঝাঁটা গোঁফ যেন হাসছে! এই প্রথম লোকটাকে হাসতে দেখলাম, "শিয়োর ইট ইজ় ইনটেলিজেন্ট।"

এরই মধ্যে দরজায় গোটা চারেক মুশকো মুশকো লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

পুত্তারুদ্রারাদ্য তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও, তোমরা এসে গেছ?" তার পর গৌতমের দিকে ফিরে বলল, "তা হলে, কী ঠিক করলে? আমি কিন্তু পুলিশে খবর দিয়েই এসেছি যে, তোমাকে সরানো হবে। কাজেই ঝামেলা করে লাভ হবে না। কোনও হোটেলে গিয়ে ওঠো আজকে, কাল বাড়ি রওনা দাও।"

'স্যর, প্লিজ়!'

পুত্তারুদ্রারাদ্য বলল, "ঠিক আছে। তোমার কথাই রইল, এক মাস বাদে তুমি ভাড়া শোধ করবে, যে ভাবে পারো। তবে এটা আর ফেরত পাবে না," এই বলে এগোতে থাকল ওয়ার্ডরোবের দিকে।

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। উপায় না-দেখে সাইরেন বাজিয়ে দিলাম। সব থেকে কর্কশ আওয়াজটা। এত জোরে বাজল যে, লোকটা থতমত খেয়ে গেল।

"হোয়াটস দিস!"

"কী জানি স্যর, ব্যাটারিতে চলতে গিয়ে..."

"যা হয়েছে হোক, এটা আমি নিয়ে যাব। এটাকে অফ করে দাও।"

সর্বনাশ! আমার এখনও বাংলা-জোড়া তেপান্তরের মাঠ পড়ে আছে, ঝোলের-লাউ-অম্বলের-কদুটাকে সেটা বোঝাই কী করে! আমার ব্যাঙের আধুলি যে ডুমুরের ফুল হতে চলল, উড়কি ধানের মুড়কি আমি কোথায় পাব! আমি মরিয়া হয়ে বলতে থাকলাম, "স্টেলা ইজ় নাও অপারেবল ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ ওনলি। শুধু বাংলা। সো, পাগল ছাড়ো পা।"

"কী বলছে?" বুড়োটা জানতে চাইল, "এটাকে ইংলিশে চেঞ্জ করে দাও।"

"আমি বাংলায় গান গাই। আমি বাংলার গান গাই।"

"হোয়াট?"

গৌতম বলছে, "কী জানি স্যর, বুঝছি না ঠিক। খারাপই হয়ে গেল নাকি! আপনি নিয়ে যান স্যর!"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াব।"

গৌতম কেমন ঘাবড়ে থমকে গেছে। আমি আকাশ থেকে গোটা বাংলার পৃষ্ঠাগুলো নামিয়ে আনি। নামতা পড়ার মতো বলতে থাকি, "অঙ্গুরী মিনস আ রিং। সো, দ্যাট রিংস আ বেল। বাট, বেল পাকলে কাকের কী? কাক কুক্কু কাক্কেশ্বর, দাঁড়িকুলীন পুত্তারুদ্রারাদ্য ..."

"হোয়াট? এটা আমার নাম জানে?"

"পাগল হয়ে গেছে স্যর।"

"বাজে কথা, মেশিন আবার পাগল হবে কী?" লোকটা আরও দু'পা এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়।

আরে, তোর এত সাহস! আমি কয়েকটা বাংলা থান-ইট বেছে নিচ্ছিলাম তখন— যেমন, অলম্বুষের ব্যাটা, ভেটকি-মুখো, যমের অরুচি, কিন্তু তক্ষুনি মেলটা ঢুকল। গত সপ্তাহে যে-ইন্টারভিউটা দিয়ে এসেছিল গৌতম, তার উত্তর। স্পোর্টস শু কোম্পানির রিজিয়নাল ম্যানেজারের চাকরি। আমি গড় গড় করে বাংলায় বলে গেলাম চিঠির কথাগুলো। গৌতম লাফাতে থাকল। পুত্তারুদ্রারাদ্য বলল, "কী ব্যাপারটা বলো তো?"

গৌতম মুখ খোলার আগেই আমি বললাম, "জুতো। তোর মুখে," বললাম বাংলায়।

ছবি: সুমন পাল

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ২০০০-এর মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamela@abpmail.com

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন ‘দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স’-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’ কোন সাহিত্যিকের লেখা?

2 এ বছর স্কোয়াশ বিশ্বকাপ ভারতের কোথায় অনুষ্ঠিত হল?

এআই (প্রতীকী)

3 আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবসের এ বছরের থিম ‘লেটস মুভ’। কত তারিখে পালিত হয় এই দিবস?

অলিম্পিক্স সিম্বল

4 কারি ইশাদ আম সম্প্রতি জিআই ট্যাগ পেল। এটি ভারতের কোন রাজ্যের আম?

5 প্রফেসর শঙ্কুর আবিষ্কৃত এই পিস্তলটি শত্রুকে রক্তাক্ত না-করে, নিশ্চিহ্ন করে। কী নাম পিস্তলের?

6 অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সম্প্রতি কোন কিংবদন্তি বাঙালি ফুটবলারের জন্মদিনকে ‘এআইএফএফ গ্রাসরুটস ডে’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

ফুটবল

7 পরাধীন ভারতে, ১৯৩৩ সালে, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে হত্যার অপরাধে কোন বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল?

8 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই-এর পুরো কথা কী?

9 আরুমোলি বর্মন ছিল এই সম্রাটের আসল নাম। তবে তিনি বিখ্যাত প্রথম রাজরাজ হিসেবেই। ইনি কোন সাম্রাজ্যের সম্রাট?

মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর কোন দেবতার উপাসক ছিলেন?

২০ জুন সংখ্যার উত্তর

১। তামিলনাড়ু।
২। চিলে।
৩। প্রনিথ ভুপ্পালা।
৪। ২৩ মে।
৫। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন।
৬। বিরাট কোহলি।
৭। বর্ধমান।
৮। সমুদ্রগুপ্ত।
৯। হরি বুধা মাগার।
১০। গেয়র্গি গসপদিনভ।

সঠিক উত্তরদাতা

প্রত্যয়ন মণ্ডল, *চতুর্থ শ্রেণি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, কলকাতা।*
বৈশালী পোদ্দার, *অষ্টম শ্রেণি, অগজ়িলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।*
বিতান পোদ্দার, *সপ্তম শ্রেণি, ডন বস্কো স্কুল, ব্যান্ডেল।*
অনিরুদ্ধ সিংহ, *সপ্তম শ্রেণি, বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর চব্বিশ পরগনা।*
উদ্দীপ্ত রানা, *সপ্তম শ্রেণি, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ), মুরাদপুর, পূর্ব মেদিনীপুর।*
শুভদীপ দে, *পঞ্চম শ্রেণি, বরানগর রামেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, বরানগর (উত্তর চব্বিশ পরগনা)।*
অতসী মিত্র, *অষ্টম শ্রেণি, সাউথ সাইড গার্লস হাই স্কুল, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।*
সাইম আহমেদ সরদার, *অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।*

উত্তর পাঠাও ১০ অগস্টের মধ্যে, anandamelamagazine@gmail.com এই ঠিকানায়।

লাইফস্টাইল

বর্ষাকালে কী কী ভরসা?

দু’-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে কি পড়েনি, তিতির হ্যাঁচ্ছো, হ্যাঁচ্ছো শুরু করেছে। আলাপের পর আসছে আসল বিস্তার... গলা দিয়ে লাগাতার বিটকেল শব্দ। গেনু শুনলেই বলে উঠছে, ‘বগ ডাকা’। শুনলেই ইচ্ছে করছে ঠাঁই করে একটা চাঁটি কষিয়ে দিতে। কিন্তু শরীরটা এত দুর্বল যে, জোর পাচ্ছে না। চোখটাও কট কট করছে। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। নাক পুরো সিল্ড। অল্প-অল্প কাশি হচ্ছে। ক’দিন বাদে দেখা যাচ্ছে, কাশিটা শিকড়ও ছড়িয়ে ফেলেছে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঘটছে না অবশ্য। সুখের বিষয়, দু’দিন পরই গেনুও ক্লিন বোল্ড হচ্ছে। ঘন ঘন বাথরুমে ছুটতে হচ্ছে তাকেও। এ বার?

বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে খুব। পেট হোক বা ফুসফুস। বৃষ্টির জলে ছুপ্পুস করে পা ডোবাতে সব ছোটরা ভালবাসে যেমন, তেমনি বর্ষা ভালবাসে জীবাণুরাও। আমরা নীতিবাগিশ পুলিশ হচ্ছিও না। কিন্তু যদি এক-দু’বার ভেজোও, তা হলে চট করে বাড়ি এসে গরম জলে স্নান করে হাত-পা শুকনো করে মুছে নেবে। তবে ভেজার ছাড়পত্র এক-দু’দিনের জন্যই। অন্য সময়ে বাইরে বেরোলে রেনকোট পরে, ছাতা নিয়ে তো বেরোবেই। টিউশনি বা আঁকার ক্লাসে যেতে হলে ব্যাগে সব সময় মনে করে জিনিসগুলো রাখবে। আর রাখবে ছোট্ট তোয়ালে রুমাল। বর্ষায় বাইরের খাবার খাওয়া মানেই বিপদ বরণ করে আনা। এ সময় ফুচকা, আলুকাবলি বা বিরিয়ানি তো নয়ই, বাড়িতেও অনেক ক্ষণ কাটা ফল খাওয়া যাবে না। ফল নিতে অসুবিধে হলে টিফিনে ড্রাই ফ্রুট, বাদাম বা কর্নসেদ্ধ খাও। এগুলো সবই উপকারী বিকল্প। রাতের দিকে তেমন কিছু না হলেও মরসুমভর নুনজলে গার্গল, ভেপার নেওয়া বা ফুটবাথ নিলে বেশ আরাম লাগবে। যারা ইনহেলার নাও, খাওয়া-ঘুমের মতো মনে করে নিতে হবে। এগুলো সবই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা। এক বার সর্দিকাশি বা পেট খারাপের ডেরায় পা রাখলে তেনাদের আক্রমণ সহ্য করতেই হবে।

আমার বই

আমার বাংলা

একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্লাদে হঠাৎ সবুজ হয়ে গেছে... কী অপূর্ব এই লাইনটা, তাই না? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই বইটি যদি কখনও পড়ো, এ রকম এক উদাসীন গদ্যের মেঘ তোমায় ঘিরে থাকবে। কী হালকা চালে বোনা অথচ কী গভীর ব্যঞ্জনায় মোড়া আত্মজৈবনিক এই বইয়ের লেখাগুলো। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-বন্দরে ঘুরে লেখক যেমনটি দেখেছেন, তেমনই অক্ষরের মানচিত্রে ফুটিয়েছেন। কী অদ্ভুত আর বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা! একটু পড়ি শোনো— *সাতকাহনিয়া, সাগরপুতুল, সাগিরা, কোটালঘোষ, আয়মা, দর্শিনী, বনবাহিনী—গ্রামগুলোর ভারি সুন্দর নাম। দূর থেকে মনে হয়, দিগদিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ—সোনার ধান ওড়নার মতো হাওয়ায় উড়ছে।... ফসলের কথা জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের মানুষ মাঠ থেকে মুঠো মুঠো বালি তুলে দেখিয়ে দেবে— মুখে একটা কথাও বলবে না।* এই উপমার মধ্যে দিয়েই যেন ধরা পড়েছে বইয়ের আত্মা, যার নাম বাংলাদেশ। শাসকের শোষণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামের পর গ্রাম, সর্বস্ব খুইয়ে ভিটে ছেড়ে শহরে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল, উদয়াস্ত খেটে প্রাপ্য মজুরি না পেয়ে ধুঁকতে থাকা পরিবার, বৃষ্টিতে নিরীহ মানুষকে ছাতা ধার দিয়ে সুকৌশলে সুদের হার চাপানো মহাজন। কিংবা বা সার্কাসে কাজ করা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সকাল থেকে যারা কসরতের খেলার প্র্যাকটিস করে। একটু ভুল হলেই মালিকের চাবুক জোটে। তাদের করুণ চোখ দেখলেই মনে পড়ে মা বা ছোট ভাইবোনদের কথা ভাবছে। এমন সব কাঁপতে থাকা, গুমরোতে থাকা, কাঁদতে থাকা মানুষদের নিয়েই ‘আমার বাংলা’। ছিলায় টানটান আশ্চর্য মায়াময় গদ্য... চোখ ভিজে যাওয়া করুণ সব গল্প... যা হয়তো যতটা বিস্ময়ের, ততটাই চোয়াল শক্ত করারও। বইটির আরও একটি অহঙ্কার বা অলঙ্কার— শিল্পী চিত্তপ্রসাদের অলঙ্করণ এবং খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ। চার দিকের রঙিন রাংতায় মোড়া পৃথিবীর খুব কাছে থাকা এক বিপন্ন ইতিহাসের বয়ান, যেখানে আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসছে হাহাকার, বঞ্চনা আর ক্ষোভ। কিন্তু লেখার মায়া তাদের গায়ে এমন আশ্চর্য নরম পোশাক পরিয়ে রাখতে পারে, তোমরা না পড়লে কখনওই জানবে না। জানবে না এই গল্প ‘মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে পাড়ার লোক আঙুল গিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিত। সেই আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ত তখন মাধবের মনে হত দুঃখিনী মা তার কাঁদছে। বর্ষায় মনটা ভারি খারাপ হয়ে যেত মাধবের’...

সুদেষ্ণা ঘোষ
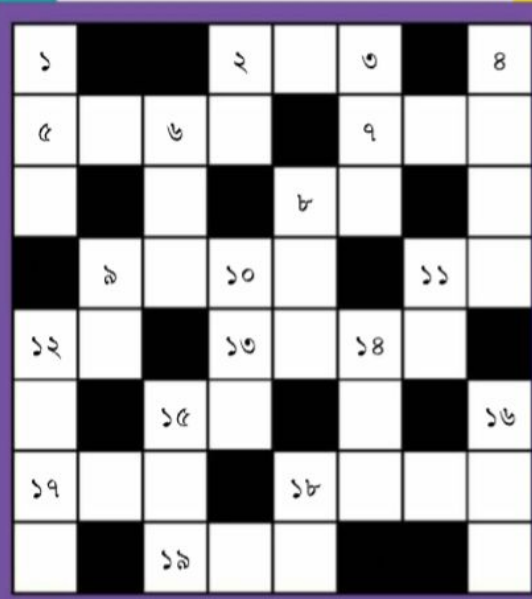
পাশাপাশি

২। সংস্কৃত কবি।
৫। নরম কাপড়।
৭। পাইন গাছের আঠা।
৮। কানের নীচের নরম অংশ।
৯। আগুন লাগলে যাদের ডাকতে হয়।
১১। কর্ণ।
১২। শক্তি।
১৩। অন্নজল।
১৫। সত্যিকে হিন্দিতে যা বলে।
১৭। মাঝিমাল্লার ভাষায় 'এগিয়ে যাও।'
১৮। গন্ডগোল।
১৯। বড় বিলাসবহুল নৌকা।

উপর-নীচ

১। নারী।
২। কপাল।
৩। কিছু সময়ের ছেদ।
৪। মহাভারতের কর্ণ যা করার জন্য বিখ্যাত।
৬। মর্মকে চলতি ভাষায় যা বলে।
৮। মেয়ে।
৯। গোষ্ঠী।
১০। কখনও।
১১। চ্যাংমুড়ি ...।
১২। দ্রুত গতিতে চাকা যে ভাবে ঘোরে।
১৪। উন্মাদ।
১৫। কোলাহলপূর্ণ।
১৬। মুখের সামনের কুচো চুল।
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস।

গত সংখ্যার সমাধান

ন				স	মা	ধা	ন
র	ম	র	মা		ত		ট
ম	হা			মা	লা		ব
	জ	ন	ক			পা	র
বা	ন			ব	জ	রা	
ন		ক	র			পা	কা
ভা		ন		অ	বি	র	ত
সি	লি	ক	ন				লা

শালুক

কাগুজে জলহস্তী

নিজের হাতে

উপকরণ: হালকা বেগুনি, বেগুনি, কালো ও সাদা রঙের অরিগ্যামি কাগজ, কম্পাস, কাঁচি, স্কেচপেন ও আঠা।

কী ভাবে করবে:

১। প্রথমে কম্পাস দিয়ে গোল করে হালকা বেগুনি রঙের অরিগ্যামি কাগজ থেকে ছবি দেখে একটা গোল কেটে নাও।

২। এ বার বেগুনি অরিগ্যামি কাগজ থেকে ছবি দেখে ডিম্বাকৃতি একটা গোল কেটে ফ্যালো। কালো অরিগ্যামি কাগজ থেকে কেটে নাও দুটো করে একটু বড় ডিম্বাকৃতি গোল, আর দুটো ছোট ডিম্বাকৃতি গোল।

৩। ছবি দেখে হালকা বেগুনি ও বেগুনি কাগজ থেকে জলহস্তীর কানের জন্য কেটে নাও দুটো দুটো চারটে করে আকার।

৪। সাদা অরিগ্যামি কাগজ কেটে বানিয়ে ফেলো চোখের জন্য দুটো ছোট গোল আর দুটো দাঁত।

৫। এ বার আঠা দিয়ে প্রথমে বড় গোলটার উপর বসাও ডিম্বাকৃতি বড় গোল। তার পর একে একে ছবি দেখে লাগিয়ে নাও চোখ, কান, দাঁত। শেষে স্কেচপেন দিয়ে এঁকে দাও হাসির রেখা।

ব্যস, তৈরি তোমার কাগজের জলহস্তী।

বৈশালী সরকার

জলহস্তীর উপকরণ

কাগজের জলহস্তী

উইলিয়াম কেরির সমাধি

বাংলা রেনেসাঁসের এক কান্ডারির সমাধিস্থল নিয়ে লিখেছেন **সুদেষ্ণা ঘোষ**

পৃথিবীতে কত কিছুই ঘটে, যা ঠিক নিয়মমাফিক নয়। আর সে জন্যই পৃথিবী তার কক্ষপথে হয়ে ওঠে বেশ কিছুটা ছন্দোময়। হাওয়ায় ভেসে আসে নতুন যুগের সুবাস। এই রকমই একটি ঘটনা ১৭৯৩ সালের নভেম্বর কেরির সপরিবারে ব্রিটিশ-অধিকৃত কলকাতায় পা রাখা। কেননা প্রথমে নাকি তাঁর সফরের অনুমতি মেলেনি! বাংলা নবজাগরণের মানচিত্রে এই খ্রিস্টান মিশনারির নাম ও অবদান বহু দিন নক্ষত্রের আলো ছড়াবে। কত কী করেছেন তিনি! জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা। তার পরের মাইলফলক শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ থেকে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'দিগদর্শন' ছাপা হয়েছিল এখান থেকে। তাঁদের মূল লক্ষ্য ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার হলেও যে-কোনও মানবদরদির মতোই কেরি এ দেশের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করেছেন মেয়েদের শিক্ষা থেকে সতীদাহ অবসানের জন্য। শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন তাঁরই অনন্য কীর্তি। এ দেশের ছাত্রদের বইয়ের অভাব মেটাতে ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন কিংবা ১৮২০ সালে ভারতের প্রথম কৃষি সমিতি স্থাপিতও হয় তাঁরই উদ্যোগে। বহু গুণের আধার বিদেশিটি না এলে অনেকখানি পিছিয়ে থাকত বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষার ঐতিহ্য। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, মার্শম্যানের সঙ্গে রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও কেরি প্রস্তুত করেন বাংলা, সংস্কৃত ও মরাঠি ভাষার অভিধান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা, মরাঠি ও সংস্কৃতের শিক্ষক কেরিকে বলা হয় বাংলা গদ্যের অন্যতম জনক। তবে আসল কথা হল, এ সবই তাঁকে করতে হয়েছে গাঢ় অন্ধকারে ডুবন্ত সময় এবং গোঁড়ামির সঙ্গে তুমুল লড়াই করে। সেই লড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও হয়তো আমরা কোনও দিন বুঝতে পারব না। শুধু শ্রীরামপুরে গিয়ে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের সমাধিক্ষেত্রে এক বার ছুঁয়ে আসতে পারি ঝরা পাতায় ঢেকে যাওয়া তাঁর সমাধিফলক। শিহরিত হতে পারি দুশো বছরের পুরনো এক লড়াকু মানুষের স্মৃতিনিশান দেখে, যিনি পশ্চিমি হয়েও এ দেশের মানুষের জন্য টান মেরে খুলে দিয়েছিলেন অনেক জানলা। আলোকিত পুবের দিকে। সূর্যোদয়ের দিকে।

কেরির সমাধিফলক

চন্দ্রযান-৩

চন্দ্রযান-৩

চার বছর আগে ভারতের চন্দ্রযান-২ চাঁদ অবধি পৌঁছেও তার মাটি ছুঁতে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সেই ব্যর্থতা ভুলে গত ১৪ জুলাই 'বাহুবলী' রকেটে চেপে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দিল নতুন, চন্দ্রযান-৩। সব ঠিক থাকলে সে আগামী ২৩-২৪ অগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে অবতরণ করবে।

উত্তর ভারতে বন্যা

জলমগ্ন দিল্লি

গত চল্লিশ বছরে এত বৃষ্টি হয়নি দিল্লিতে, যা এ বছর হল। যার ফলে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা সহ আরও উত্তর ভারতের আরও কিছু রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেসে গেল বন্যার জলে। নদীর জল উপচে গ্রাম, শহর, সড়ক, জঙ্গল ভাসিয়ে দেওয়ায় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি তো হলই, অসহায় মানুষের জীবনহানিও ঠেকানো গেল না।

শুক্র গ্রহে ফসফিন

শুক্র গ্রহ

পৃথিবীতে ফসফিন নামে এক রকম গ্যাস তৈরি করে অণুজীব বা মাইক্রোঅর্গানিজ়মরা। ২০২০ সালে প্রচণ্ড গরম শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাইরের দিকেও ফসফিন খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানীরা চমকে গেছিলেন। এ বছর আবার শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলের আরও গভীরে ফসফিন পাওয়া গেছে। এও কি তবে অণুজীবের কাণ্ড? বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

আসন্ন সৌরঝড়

সূর্যে প্রায়শই ছোট-বড় সৌরঝড় ওঠে। জ্যোতির্বিদদের গণনা বলছে, ২০২৫ সালে সৌরচক্রের 'সোলার ম্যাক্সিমাম' পর্বে ঢুকে পড়বে সূর্য। যার জেরে ২০২৪ সাল থেকেই বাড়বে সৌরঝড়ের প্রকোপ। সৌরঝড় বাড়লে পৃথিবীতে আমাদের ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট অনেক কিছুই বিগড়ে যেতে পারে বলে সকলের আশঙ্কা।

শিল্পীর কল্পনায় সৌরঝড়

যা হবে

আন্তর্জাতিক চন্দ্র দিবস

চাঁদ

আকাশের গায়ে চাঁদ এবং তার পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি ও ক্ষয় সেই কবে থেকে মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টান এড়িয়ে কোনও দিন চাঁদে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে, এ অসম্ভব কে কবে প্রথম ভেবেছিল জানা নেই। সেই অসম্ভব সম্ভব হল ১৯৬৯ সালে। সে বছর ২০ জুলাই মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসার পাঠানো যানে চেপে চাঁদে পৌঁছোলেন তিন নভশ্চর। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে পূর্ণিমার চাঁদের মতোই উজ্জ্বল সেই দিনটা মনে রেখে আজও প্রতি বছর ২০ জুলাই বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক চন্দ্র দিবস।

জাতীয় আম দিবস

সবার প্রিয় আম

আম শুধু আমাদের দেশের জাতীয় ফলই নয়, তাকে বলা হয় ফলের রাজা। সুস্বাদু আমের পুষ্টিগুণও অন্য ফলের তুলনায় ঈর্ষণীয়। আজ সারা পৃথিবীতে যত আম ফলানো হয়, তার অন্তত ৫০% পাওয়া যায় ভারত থেকেই। ভারতের পরেই সবচেয়ে বেশি আম ফলানো হয় পড়শি দেশ চিনে। এ হেন রাজকীয় ফলের জন্য ধার্য আছে আস্ত একটা দিন। আমাদের দেশে জাতীয় আম দিবস পালিত হয় প্রতি বছর ২২ জুলাই। এ বছরও হবে।

বাঘ

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

একশো-দুশো বছর আগেও পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা প্রজাতি, উপপ্রজাতির বাঘ মহানন্দে খেলে বেড়াত। কিন্তু মানুষের অত্যাচারে কোণঠাসা হতে হতে ওদের সংখ্যা অনেক দিন থেকেই বিপজ্জনক হারে কমতে শুরু করেছিল। বাঘেদের সৌভাগ্য, ওরা একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার আগেই মানুষের টনক নড়েছে। বিশেষত আমাদের দেশ বাঘ সংরক্ষণে যত্ন নেওয়ায় গত ক'বছরে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে। এই আবহে সামনেই আসছে ২৯ জুলাই, আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস। এই গ্রহ যতটা মানুষের, ঠিক ততটাই রাজকীয় এই প্রাণীরও— এ কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার দিন।

সাফ কাপ জয় ভারতের

নবম বার সাফ কাপ জিতল ভারতীয় দল। সঙ্গে তৈরি করল আগামীর জন্য ইতিহাস। লিখেছেন **সায়ক বসু**

অমরত্বের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন সুনীল ছেত্রী। বলা ভাল, ভারতীয় ফুটবলের মাথায় সাফ কাপ জয়ের পালক ফের এক বার লাগিয়ে এই পথটা আরও মসৃণ করে দিল তাঁর দল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কুয়েতকে হারাল ভারত। এবং খুব অদ্ভুত ভাবে কোথাও যেন মিলে গেল আর্জেন্টিনার বিশ্বজয় এবং ভারতের এই জয়। সেখানেও লিয়ো মেসির জন্য জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার বাকি দশ খেলোয়াড়।

ফাইনালে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন গোলকিপার এমি মার্টিনেজ়। এখানেও সুনীলের 'শেষ' সাফ কাপ টুর্নামেন্টে গোটা দলের পাশাপাশি বিশেষ ভূমিকা নিলেন ভারতের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু। তাঁর দক্ষতায় সাডেন ডেথে ম্যাচ জিতল ভারত। টাই ব্রেকারের প্রথম এবং সাডেন ডেথের প্রথম শট বাঁচিয়ে গোটা স্টেডিয়ামে আগুন জ্বালালেন তিনি। সেই আগুন খুশির, ফিরে আসার, ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন পুনরুদ্ধার করানোর, সর্বোপরি সুনীল ছেত্রী নামক মানুষটার এত দিনের আত্মত্যাগ, পরিশ্রম ও একাগ্রতার প্রতিদানের।

আসলে সুনীল খুব সময় নিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন এই ভারতীয় দল, যেখানে সন্দেশ ঝিঙ্ঘন, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে এবং শুভাশিস বসুরা হার-না-মানা মনোভাব নিয়ে খেলে যান শেষ পর্যন্ত। এবং জেতার শেষে এক সঙ্গে গলা মেলান 'বন্দে মাতরম' গানে। বিশ্ব ফুটবলে ভারত এত দিন যে অবহেলা সহ্য করে এসেছে, তার শেষ দেখে ছাড়াই যেন এই দলের লক্ষ্য। তাই তো বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০০-এ চলে এসেছে এই দেশ।

গোটা সাফ কাপে এ বার দাপট নিয়েই খেলে এসেছে ভারতীয় দল। কিন্তু তাও কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলাটা সহজ ছিল না। খেলার শুরুও হয় সেই লড়াই দিয়েই। অবশ্য প্রতিটা ম্যাচেই লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন কোচ ইগর স্তিমাচ। সুনীলের পাশাপাশি যদি আর কাউকে ভারতীয় দলের এই উত্থানের কৃতিত্ব দেওয়া যেতে পারে, তিনি এই কোচ। দলের প্রতিটি সদস্যকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছিলেন তিনি। যাই হোক, ফাইনালে ভারতীয় দল খেলা শুরু করে কিছুটা মন্থর ভাবে। ১৫ মিনিটে কুয়েত গোল করার পর ধীরে-ধীরে খেলায় ফেরে ভারত। ৩৮ মিনিটে সমতায় ফেরে ছাংতের গোলে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বর্ষসেরা ফুটবলার ছাংতে এখন দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১-১ গোলেই শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ভারত আর-একটি গোল পেতে পারত। কিন্তু সেটি তো হয়ইনি, বরং দুই দলের খেলোয়াড়রা বার বার মাথা গরম করেছেন। একান্তর মিনিটে মহেশ এবং রোহিত কুমারকে এক সঙ্গে মাঠে নামালেও ভারতের সহকারী কোচ মহেশ গাউলির এই কৌশল কাজে আসেনি। কারণ মাথা গরম করে হলুদ কার্ড দেখেন রোহিত। একটা সময় সুনীলকে হাতজোড় করে সতীর্থদের মাথা ঠান্ডা রাখতে অনুরোধ করতেও দেখা যায়। কিন্তু যে খেলার উত্তেজনাই এ রকম, সেখানে খেলোয়াড়দের মধ্যে সেই আঁচ পড়বে না, তা কখনও হয়? ফলে সেই উত্তেজনা ধরে রেখেই খেলা একস্ট্রা টাইম পেরিয়ে টাইব্রেকারে গেল। এবং যা হওয়ার তা-ই হল। প্রথম পাঁচটি গোলে মীমাংসা না হওয়ায়, খেলা গেল সাডেন ডেথে। সত্যি কথা বলতে কী, টাই ব্রেকারে নার্ভ ধরে রাখাটাই আসল। সেটা গুরপ্রীত যেমন ধরে রেখেছিলেন, রেখেছিলেন মহেশ সিংহও। কারণ সাডেন ডেথে ভারতের তরফ থেকে জয়সূচক গোলটি করেন তিনিই। এবং তাঁর দৌলতে ভারত নবম বারের জন্য সাফ কাপ জেতে। প্রতিবেদনের শুরুতেই যেটা বলছিলাম, আটত্রিশ বছরের সুনীল ছেত্রী খুব পরিশ্রম করে এমন একটি দল তৈরি করতে পেরেছেন, যাঁদের মূলমন্ত্রই হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধতা। সুনীল শেষে গোটা দলের কাঁধে চেপে পতাকা ধরলেন বটে, কিন্তু আগুনটা তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। ভারতীয় ফুটবলের পোস্টারবয় এমন কিছু কৃতিত্ব সামনে রাখলেন, যা পাথেয় করে এগিয়ে যেতে পারবে ভারতীয় ফুটবল।

সুনীলকে নিয়ে সতীর্থদের উল্লাস

সাফ কাপে দাপট দেখিয়েছে ভারত

গুরপ্রীতকে ঘিরে আনন্দ সকলের

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

জিমন্যাস্টিকসে ফিরলেন দীপা

দীপা কর্মকার

অনেক দিনই তিনি পরিচিত ফ্লোরের বাইরে ছিলেন। ডোপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পারায় দীর্ঘ একুশ মাস নির্বাসনে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ভারতীয় জিমন্যাস্টিক্সের সেরা মুখ সেই দীপা কর্মকার আবার ফ্লোরে ফিরে এসেছেন। নির্বাসন কাটিয়ে শুধু ফিরে আসাই নয়, সদ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এশিয়ান গেমসে ট্রায়ালে নেমে মেয়েদের অলরাউন্ড বিভাগে শীর্ষ স্থান দখল করেছেন। আসন্ন এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন দীপা। আগামী সেপ্টেম্বরে চিনের হ্যাংঝাউতে বসবে এশিয়ান গেমসের আসর। ২০১৬ রিয়ো অলিম্পিক্সে প্রদুনোভা ভল্ট দিয়ে সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন ত্রিপুরার এই বাঙালি কন্যা। ২০১৭ ও ২০১৯ সালে পর পর দু'টি অস্ত্রোপচার দীপাকে কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসার লড়াইয়ের মধ্যেই তাঁর ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়া। নমুনা পরীক্ষায় দীপার শরীরে নিষিদ্ধ ওষুধ হাইজেনামিনের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এই ওষুধ ব্যবহার করলে ফুসফুসে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়। যদিও দীপা জানিয়েছেন, ঘটনাটা তাঁর অজান্তেই ঘটেছে। তবু নির্বাসন আটকানো যায়নি। আবার ফ্লোরে ফিরে এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জন করে দীপা তাই খুশি। খারাপ সময়টাকে ভুলে এ বার সামনের দিকে এগোতে চান ঊনত্রিশ বছরের এই জিমন্যাস্ট। কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীও চান, দীপা আবার সাফল্যে ফিরুন।

রিয়ালে খেলবেন বেলিংহাম

এক সময় জিনেদিন জিদান পাঁচ নম্বর জার্সি পরে রিয়ালের হয়ে মাঠে নামতেন। এ বার জিদানের সেই জার্সি গায়ে চাপিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে মাঠে নামছেন উনিশ বছরের তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। কাতার বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। বেলিংহামের পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার শুরু ইংলিশ ক্লাব বার্মিংহাম সিটিতে। ৩০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ২০২০ সালে তাঁকে দলে নিয়েছিল জার্মানি বুন্দেশলিগার ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। গত তিন বছরে বুন্দেশলিগার অন্যতম সেরা ফুটবলার হয়ে ওঠেন তিনি। ইউরোপের এই তরুণ প্রতিভাকে দলে টানতে তাই বেশ কিছু দিন আগেই ঝাঁপিয়ে ছিল রিয়াল। এ জন্য স্পেনের এই ক্লাবটিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এই মরসুমের ত্রিমুকুটজয়ী ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে লড়তে হয়েছে। অবশেষে ১০৩ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি দিয়ে বেলিংহামকে দলে নিয়েছে রিয়াল। যদিও শোনা গিয়েছে, পরে আরও বাড়তি ২০ মিলিয়ন ইউরো যোগ হতে পারে। ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনা পেরেজ বেলিংহামের হাতে পাঁচ নম্বর জার্সি তুলে দিয়েছেন।

জুড বেলিংহাম

নীরজের নজরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ

নীরজ চোপড়া

আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন নীরজ চোপড়া। ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিক্সে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনাজয়ী এই ভারতীয় অ্যাথলিট এখন নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে দিয়েছেন। দোহা ডায়মন্ড লিগে সোনা জিতে মরসুম শুরু করেছিলেন। এর পর চোটের কারণে তাঁকে বিরতি নিতে হয়। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে সদ্য লুজানে ৮৭.৬৬ মিটার ছুড়ে আবারও সোনা জিতেছেন নীরজ। ২০২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিক্স। তার আগে ১৯ অগস্ট হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ই তাঁর লক্ষ্য।

সোনার মেয়ে রেজ়ওয়ান

রেজ়ওয়ান মল্লিক হেনা

অ্যাথলেটিক্সে একের পর এক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে এখন সাফল্যের মধ্য গগনে নদিয়ার এই মেয়ে। নাম রেজ়ওয়ান মল্লিক হেনা। গত এপ্রিলে উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনূর্ধ্ব ১৮ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের এই প্রতিশ্রুতিমান অ্যাথলিট জোড়া সোনা পান। সঙ্গে একটি রুপো। ৪০০ মিটারের ব্যক্তিগত দৌড়ে ৫২.৯৮ সেকেন্ড সময় করে নতুন রেকর্ড গড়েন হেনা। পরে মিক্সড রিলেতে সোনা জয় করেন। ২০০ মিটার দৌড়ে নেমে দেশকে রুপো এনে দেন ষোলো বছরের এই অ্যাথলিট। গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চিয়নে অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনার সঙ্গে একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ৪০০ মিটার দৌড়ে ৫৩.৩১ সেকেন্ড সময় করে সোনা জিতে আনেন হেনা। এখন তিনি বেঙ্গালুরুতে কোচ অর্জুন অজয়ের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে হেনার দৌড়ের একটি ভিডিয়ো দেখে কোচ অর্জুন হেনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২০২১ সাল থেকে পড়াশোনার বইপত্রকে সঙ্গী করে হেনা তাই বেঙ্গালুরুবাসী। জাতীয় পর্যায়ে অনূর্ধ্ব ১৬ ওপেন ন্যাশনাল এবং ইউথ ন্যাশনালেও রেকর্ড আছে হেনার।

দুরন্ত ছন্দে গুরপ্রীত

সাফ কাপের অসাধারণ গোলকিপিং তাঁকে খবরের শিরোনামে তুলে এনেছে। সেমিফাইনালে লেবানন এবং ফাইনালে কুয়েতের বিরুদ্ধে ভারতের গোলসীমানায় এক দুর্ভেদ্য প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ভারতকে নবম সাফ কাপ এনে দিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু। বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে লেবাননের বিরুদ্ধে একাধিক গোলই বাঁচাননি গুরপ্রীত, টাইব্রেকারে বিপক্ষ দলের অধিনায়ক হাসান মাতুকের শট আটকে সুনীল ছেত্রী, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেদের ফাইনালে ওঠার রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। ফাইনালে কুয়েতের বিরুদ্ধেও জয়ের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন সেই গুরপ্রীত। সাডেন ডেথে কুয়েত অধিনায়ক খালিদ হাজিয়ার শট বাঁ দিকে শরীর ছুড়ে বাঁচাতেই ভারত আবার সাফ কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। একত্রিশ বছরের গুরপ্রীত এই মুহূর্তে বেঙ্গালুরু এফসি-র গোলরক্ষক। ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবলার। আগামী বছরের জানুয়ারিতে এশিয়া কাপ ফুটবল। গুরপ্রীতের নজর এখন সে দিকেই।

গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু

আনন্দকে হারালেন গুকেশ

দাবায় বড় অঘটন ঘটিয়ে নজর কেড়েছেন ভারতের ডি গুকেশ। জ়াগ্রেবে সুপার ইউনাইটেড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ় দাবায় পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে দাবা দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন সতেরো বছরের গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ। প্রতিযোগিতার অষ্টম রাউন্ডে এই অঘটন ঘটিয়েছেন। ২০১৯ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হন। প্রখ্যাত দাবাড়ু সের্গেই কারইয়াকিনের পরে তিনিই বিশ্বের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার। আনন্দকে হারিয়ে গুকেশের অভিব্যক্তি, “এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু হয় না।”

ডি গুকেশ

বিদেশিহীন কলকাতা ফুটবল লিগ

মাঠে নামার প্রস্তুতি ফটো: লেখক

কলকাতা ফুটবল লিগের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম ডিভিশনের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই। গত ২৫ জুন সন্তোষপুরের কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ডায়মন্ডহারবার এফসি বনাম সার্দান সমিতির ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে এ বারের কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা। নতুন নিয়মে কলকাতা ফুটবল লিগ এ বার বিদেশিহীন। ইতিমধ্যে ময়দানের তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিংও মাঠে নেমে পড়েছে। লিগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাঠে নেমেছে যুব দল। এই মরসুমে মোহনবাগানের নতুন নাম হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ক্লাবের জার্সি ও লোগোতেও বদল এসেছে। মোট ২৬টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে শুরু হয়েছে প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা। প্রতি গ্রুপে ১৩টি করে দল। একটি গ্রুপে আছে গত বারের লিগচ্যাম্পিয়ন মহমেডান ও মোহনবাগান। অন্য গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল ও গত বারের রানার্স দল ভবানীপুর ক্লাব। গড়ের মাঠে কলকাতা ফুটবল লিগের আকর্ষণ বাড়াতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের নির্দেশ মেনে বিদেশিহীন লিগ চালু করেছে আইএফএ। এ ছাড়াও এই প্রথম স্মার্টফোনে প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে বাংলায় ধারাভাষ্য। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ২৬টি দলের ১৯৯টি ম্যাচ দেখা যাবে। কলকাতা লিগকে জনপ্রিয় করে তুলতে একটি বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। কলকাতা ফুটবল লিগের আকর্ষণ বাড়াতে এগিয়ে এসেছে ৪০ জন প্রাক্তন ফুটবলারের উদ্যোগে তৈরি ‘প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি’। এ বার প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের সেরা কোচ, সেরা ফুটবলার, সেরা গোলরক্ষক, সর্বোচ্চ স্কোরার ও তিন প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারকেও পুরস্কৃত করবে প্রাক্তন ফুটবলারদের ওই সংগঠন।

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পর পর খোপে লিখে ফ্যালো। এ বার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এ বারের সঙ্কেত : চির কাল, সব সময়। সিধে, সোজা।

না	রা	য়	ণ
ক	ই	মা	ছ
ছা	ত্র	ছা	ত্রী
বি	দ্যা	ল	য়

২০ জুন সংখ্যার সমাধান

না ক ছা বি

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

সহজ

							= ০

২ ৩ ৪ ৫

মাঝামাঝি

							= ১২

৩ ২ ১৩ ৭

কঠিন

							= ৬

১৬ ৮ ২১ ৭

২০ জুন সংখ্যার সমাধান :

সহজ: ৫ + ২ – (৪ – ৩) = ৬

মাঝারি: (২৩ + ৭) – (৩ – ২) = ২৯

কঠিন: (৮ × ৭) ÷ (২ × ৭) = ৪

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ১০ অগস্ট-এর মধ্যে anandamelamagazine@gmail.com ঠিকানায় পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

পরমব্রত পাল, *সপ্তম শ্রেণি, ওরিয়েন্টাল পাবলিক স্কুল, কল্যাণী, নদিয়া।* **সপ্তক ঘোষ**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, বোলপুর হাই স্কুল, বীরভূম।* **অনন্ত্রম দাস**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, খড়দহ।* **সমৃদ্ধি সাহু**, *পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, পঃ মেদিনীপুর।* **অদ্রীশ মাইতি**, *চতুর্থ শ্রেণি, সরস্বতী শিশু মন্দির, বক্সীবাজার, মেদিনীপুর।* **সৌমিলি চক্রবর্তী**, *সপ্তম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।* **স্পন্দন ভাদুড়ী**, *পঞ্চম শ্রেণি, বিড়লা হাই স্কুল, কলকাতা।* **অরুণোদয় সরকার**, *চতুর্থ শ্রেণি, কল্যাণী পাবলিক স্কুল, বারাসত।* **সৌম্যকান্ত সেন**, *সপ্তম শ্রেণি, পার্ল রোজারি ইস্কুল, হুগলি।* **বৈশালী পোদ্দার**, *অষ্টম শ্রেণি,* **বিতান পোদ্দার**, *সপ্তম শ্রেণি, অগজ্জিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, ব্যান্ডেল।* **সৌকর্য দত্ত**, *চতুর্থ শ্রেণি, বড়বড়িয়া ইউনাইটেড প্রাথমিক বিদ্যালয়, নদিয়া।* **মহ. ঈশান আলি**, *অষ্টম শ্রেণি, বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল।*